প্রণয়চিহ্ন

দিব্যেন্দু পালিত

স্বরলিপি ॥ কলকাতা-৯

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১লা ডিসেম্বর, ১৯৬১

প্রকাশক : ধীরা চৌধুরী
স্বরলিপি
২৩এ, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ : প্রীতীশ নন্দী

ছেপেছেন : তারারাণী রায়
তারকেশ্বর প্রেস
৬ শিবু বিশ্বাস লেন
কলকাতা-৬

বিমল কর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

পরিতোষ চলে যাচ্ছিলো। দরজা পর্যন্ত গিয়ে থেমে দাঁড়ালো।

নিছকই থেমে দাঁড়ানো। আমি জানি, পরিতোষের কিছু বলার নেই। অনেকক্ষণ ধরে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করেছে ও, কথা বলেছে আন্তরিক ভাষায়। এই অবস্থায় একজন বুদ্ধিমান পুরুষ যা যা করে ও যে-ভাবে, পরিতোষের ব্যবহারে তার সামান্য তারতম্য ঘটেনি। পরিতোষ, মহীতোষের ভাই, আমার দেওর। কিন্তু শুধু ওই সম্পর্কের মধ্যেই ওকে ধরে রাখা অনুচিত হবে। মানুষ হিসেবেও ওর কথা কোনোদিন আমার ভোলা উচিত নয়।

এই মুহূর্তে বুঝতে পারছি না আমার ভাবনাগুলো ঠিক খাতে বইছে কি না। মনুষ্যত্ব, কর্তব্য, এগুলো দায়ের কথা; হৃদয়ের কথা নয়। হৃদয় নির্ভর করে সম্পর্কের ওপর। হয়তো, এটাই ঠিক, সম্পর্কগুলো আগে ঠিক করে নিই আমরা – ট্রেন চলার আগে লাইন পাতার মতো করে। বিনিময়ের ব্যাপারটা আসে পরে।

চোখাচোখি হতে চেষ্টা করে হাসলাম আমি।

'কিছু বলবে?'

'কি যেন বলছিলাম – '

এলোমেলো গলায় বললো পরিতোষ। সময় নিলো। এই প্রথম ওর চোখ, মুখ, দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে অস্বস্তি লক্ষ করলাম। ও নিজেও হয়তো এই পরিবর্তনগুলো অনুভব করেছে। আস্তে আস্তে বললো, 'কিছু দরকার পড়লে খবর দিও। আবার আসবো।'

আমার পক্ষে বলবার মতো একটিই কথা আছে এখন। বললাম, 'এসো।'

আমার গলা কাঁপলো না, শরীর কাঁপলো না; মাপা স্বরে উচ্চারণ করলাম কথাটা। আমি স্থির ছিলাম।

পরিতোষ চলে গেল।

আসা না-আসাটা আপেক্ষিক ব্যাপার। পরিচয় থাকলে সেটা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু সম্পর্কের জোরে যে আসা, এখানেই তো শেষ হলো। পরিতোষ নিশ্চয়ই তা জানে। এর সবকিছুর মধ্যেই আছে একরকম নিষ্ঠুরতা, একটা উদাসীন-ঠাট্টা—যে খুন হবে, খুন করার আগে খুনীর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মতো। এ-ঘটনা আমার খারাপ লাগতে পারে; পরিতোষেরও কি ভালো লেগেছে! তা হলেও শেষ মুহূর্তে কথাটা বলে ফেললো ও। আশ্চর্য, কী সব আলগা ভিতের ওপর গড়ে ওঠে আমাদের সম্পর্কগুলো! একটা ইঁট নড়লো কি নড়লো না, সমস্ত বাড়িটাই ধ্বসে পড়লো!

দরজাটা লাগাতে পারলাম না। দাঁড়িয়ে থাকলাম চুপচাপ। অনেকক্ষণ ধরেই একটা অবসাদ ছড়িয়ে পড়ছিলো শরীরে। এখন আর কেউ নেই, থাকলো না, প্রয়োজনে যার কাছে জবাবদিহি করবো। নিজের খুব কাছাকাছি এসে এই প্রথম শূন্যতা অনুভব করলাম আমি।

বিকেল হয়ে গেছে। আকাশ মেঘলা থাকার জন্যেই সম্ভবত বেলা একটু বেশি মনে হচ্ছে। এরপর কী করবো কিছু স্থির না থাকায় চুপচাপ রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

সামনে লন। লন পেরিয়ে রাস্তা। লোকজনের যাতায়াত চোখে পড়লো। পেরাম্বুলেটর ঠেলতে ঠেলতে চলে যাচ্ছে একজন আয়া, উল্টো দিক থেকে হেঁটে এলো দু'জন যুবতী ও এক বৃদ্ধা, একজন যাচ্ছে সাইকেলে, দৃষ্টির বাইরে থেকে একটা মোটর হর্ন দিতে শুরু করলো। আমি অপেক্ষা করলাম, মোটরটা হয়তো সামনে দিয়েই যাবে। হর্ন থামলেও মোটরটাকে আর দেখা গেল না।

সমস্তই চলেছে ঠিকঠাক। শুধু আমিই থেমে আছি। একটা ভিখিরি ছেলে চলে গেল কাঁদতে কাঁদতে। তারপর কিছুক্ষণ ফাঁকা হয়ে থাকলো রাস্তা। আস্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম আমি।

ইতিমধ্যেই অন্ধকার ছড়িয়েছিলো ঘরে। তেমান নৈঃশব্দ। ছায়াচ্ছন্নতার মধ্যে খানিক নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থেকে নৈঃশব্দটা সইয়ে নিলাম। এখন থেকে আমি একা, আমার পরিচয় সীমাবদ্ধ হয়ে এলো আমার নিজের মধ্যে—এই ভাবনা কিছুমাত্র বিচলিত করলো না আমাকে, অথচ, বেশ বুঝতে পারছি, একটা প্রচণ্ড সময় শুরু হয়ে গেল। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের যদি কোনো ইতিহাস থাকে, বা ব্যক্তির, অন্তত আমার জীবনে সেই ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্যোগময় সময় শুরু হলো। এর জন্যে আমার অসহায় বোধ করা উচিত।

কিন্তু, কিছুটা নিঃসঙ্গ বোধ করলেও, তার সামান্য সংস্পর্শ পর্যন্ত অনুভব করলাম না আমি। অবস্থাটা বুঝতে পারছি, ক্ষতটা চোখে পড়ছে পরিষ্কার, অনর্গল বেরিয়ে যাচ্ছে রক্ত ; ব্যস, এই পর্যন্তই—ব্যথা বা যন্ত্রণা কিছুই কাতর করলো না আমাকে।

বলতে গেলে কোর্টের রায় বেরুনোর পর থেকেই আমার মনের অবস্থা এই রকম। মহীতোষের সঙ্গে বিচ্ছেদ পাকা হয়েছিলো এক বছর আগে। কোর্টের রায়ের জন্যে, সেই অর্থে, অপেক্ষা করতে হয়নি আমাকে। তার আগের দুটো বছর গেছে সাংঘাতিক গণ্ডগোলের মধ্যে ; প্রতিদিন, প্রতিটি মুহূর্ত কাটাতে হয়েছে অস্বস্তি ও অশান্তি নিয়ে। বর্ষাকালের মতো টানা, মেঘাচ্ছন্ন দিন ও রাত—রোদ্দুরের মুখ দেখা না-দেখা নিতান্তই আকস্মিক ব্যাপার।

আমি কি প্রস্তুত ছিলাম? আমি কি জানতাম, একদিন না একদিন কোর্ট পর্যন্ত ছুটতে হবে আমাকে, মানতে হবে ব্যভিচারের অভিযোগ, মহীতোষ আর আমি—স্বামী-স্ত্রী—বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো চিরকালের মতো?

না। এখনো ভাবলে মনে হয়, না।

বিচ্ছেদ যখন হয়েই গেছে, এখন মহীতোষের ওপর দোষারোপ করে লাভ নেই। তুমি তোমার নিজের মতো থাকো। তাছাড়া, একা মহীতোষের ত্রুটিতেই ব্যাপারটা ঘটেনি। মহীতোষ তার ব্যবসার

সুবিধের জন্যে মক্কেল ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করাতে চাইতো আমাকে। অনেকেই চায়। কিন্তু এর জন্যে যে স্বতঃস্ফূর্ততা দরকার, যে মানসিক ঔদার্য—নাগালের বাইরে স্বত্ব অধিকার করার জন্যে ভিতরের স্বত্ব কিছুটা ছাড়া, মহীতোষের তা ছিলো না। ব্যাপারটাকে কোনোদিনই সে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। এটা আমি বুঝেছিলাম পরে। বুঝিনি পর্দার বাইরে টেনে আনলেও পর্দাটাকে ছিঁড়ে ফেলতে পারেনি মহীতোষ। যখন বুঝলাম তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। সুস্পষ্ট কোনো কারণ থাকলো না, থাকলো না প্রমাণ, কিন্তু মহীতোষের চোখে ব্যভিচারিণী হয়ে গেলাম আমি।

খুবই সাদামাঠা ব্যাপার, দু'য়ে দু'য়ে চারই হয়। এ-রকম ঘটনা বইয়ে অনেক পড়েছি। কিন্তু সেটা যে ব্যবহারিক সত্য হয়ে দাঁড়াবে এবং আমার জীবনেই, তা ভাবিনি কোনোদিন! এখন মনে হয় সুস্পষ্ট অভিযোগ ও প্রমাণের চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক এই সন্দেহ জিনিসটা। খুন করার চেয়ে খুন করার ইচ্ছে মনে পুষে রাখার মতো, সন্দেহ ডেকে আনে অসহায়তা, ডেকে আনে ঘৃণা, হিংসা আর অন্ধকার। আর সেটা যদি মহীতোষের মতো পুরুষের বেলায় ঘটে—খুব সাবলীলভাবে গলায় মদের গ্লাস উপুড় করে ঢেলেও যার জিভ থেকে তেতো ওষুধের স্বাদ যায় না, তাহলে তো কথাই নেই! চমৎকারভাবে চলে আসবে সব উপসর্গ—হিংসা, রাগ, ঘৃণা, আর সেই দুর্বোধ্য ব্যাপারটা—যার কোনো স্পষ্ট চেহারা ধরা পড়ে না, অন্ধকার। আমাকে চুম্বন করার মুহূর্তে সে ভাববে আমার ঠোঁটে লেগে আছে আর একজনের জিভের স্পর্শ, যৌনসুখ উপভোগের জন্যে সে আমার গা থেকে শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া খুলে ফেলবে ছাল চামড়া ছাড়ানোর মতো করে, এমন কি সঙ্গমের মুহূর্তেও নিজের শরীরে দেখবে অন্য পুরুষের ছায়া, মনে মনে বলবে, বীচ্, বীচ্, বীচ্।

আমার একটাই ভুল হয়েছিলো। আমাকে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই জেনেও কোনো প্রতিবাদ করিনি আমি; একটা দুর্বল,

স্পর্শকাতর, সন্দেহগ্রস্ত লোককে ক্রমশ সবল হবার সুযোগ দিয়েছিলাম। মহীতোষ আমাকে কি চোখে দেখছে জানবার পর থেকেই খুঁটি আগলাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম আমি, আমার সাধ্য দিয়ে চেষ্টা করেছিলাম ওকে গভীর করে বাঁধতে। তখনো বুঝতে পারিনি, বাইরের দেয়ালে আগুন লাগলে ঘরের ভিতরের আসবাব আগলে বসে থাকার মানে হয় না কোনো, নিরাপত্তার জন্যে ছুটতে হয় বাইরে। তাতে হয়তো কিছু বাঁচে!

শেষ পর্যন্ত যা হবার তাই হলো। আসবাবসমেত আমি গেলাম পুড়ে।

ফ্ল্যাটের সব আলোগুলো একসঙ্গে জ্বেলে দিলাম আমি। গুমোট লাগছিলো ; দু' একটা জানলা খুলে দিলাম।

নিজেকে নিয়ে চিন্তায় ক্লান্তি ছাড়া আর কিছু নেই। যতো ভাবা যায় ততোই তীব্র হয়ে ওঠে অবসাদ। হতে পারে এর একটি কারণ একাকীত্ব, বাড়িটা নতুন বলে দেয়াল বা আসবাবের সঙ্গেও অপরিচয় কাটেনি ; সবই কেমন দূরত্বময় ও অস্পষ্ট—যেন একটা জাহাজের কেবিনের মধ্যে থেকে উদ্দেশ্যহীন ভেসে চলেছি। আমার ভাবনা হলো, অসহনীয় লাগলো, হয়তো চিন্তার ভার থেকে সহজে মুক্ত হতে পারবো না। হয়তো কালকের মতো আজও আমাকে ঘুমের ওষুধ খেতে হবে।

মহীতোষের প্রতি আমার আর কোনো দুর্বলতা নেই। কিন্তু ইতিমধ্যে ভিতরে ভিতরে আমিও যে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছি তা অস্বীকার করবো কী করে! যে-সংস্কারের জন্যে এতোক্ষণ দোষী করছিলাম মহীতোষকে, আমার মধ্যেও সে-সংস্কার রয়ে গেছে পুরোদস্তুর। এই দুর্বলতা মহীতোষ সম্পর্কে না হলেও স্বামী সম্পর্কে আমার ধারণার প্রতি, সংসারের প্রতি। যতোই ক্লেশের হোক, সাংসারিক সম্পর্কের মধ্যে থাকার নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে—একা হয়ে—অবচেতনায় অদ্ভুত এক ভয়ের শুরু হলো।

আঠাশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি কোনো-না-কোন অবলম্বন নির্ভর করে থেকেছি। বিয়ের আগে পর্যন্ত বাবার কাছে, তারপর স্বামীর কাছে। পায়ের পাতা এখনো তাই খুব নরম হয়ে আছে।

আলস্য কাটানোর জন্যে বাথরুমে গিয়ে চটপট স্নান সেরে নিলাম। কিছুটা চাঙ্গা লাগছিলো; সদ্য মোড়ক খোলা সাবানের ভুরভুরে গন্ধটা তৃপ্তি এনে দিলো। পরিতোষ থাকতেই এক প্রস্থ চা হয়েছিলো। গ্যাস জ্বেলে এখন আবার চায়ের জল চাপিয়ে দিলাম। জিনিসপত্র সবই মজুত আছে, রাতের খাবারও তৈরি করতে হবে আমাকে। সে-জন্যে কিছু ভাবছি না। কাল বা পরশু থেকে একটা লোক পাওয়া যেতে পারে।

আগাগোড়া ফার্নিশড্ এই ফ্ল্যাটটা পেয়ে আমি খুশিই হয়েছি। গোছগাছের জন্যে ভাবতে হয়নি কিছু। বাকি যা করার পরিতোষই করে দিয়ে গেছে। এই ফ্ল্যাটটাও তারই খুঁজে দেওয়া। বস্তুত, আমার অসুবিধের কথা চিন্তা করে রীতিমতো সাবধান ছিলো পরিতোষ— একা মেয়েমানুষের নিরাপত্তা ও সম্মানে যাতে কোনোরকম বিঘ্ন না ঘটে সে-জন্যে ওর তৎপরতার অন্ত ছিলো না। আমি ঠকিনি।

এখন বিষয়টা ভেবে আমার হাসি পেলো। বয়সে পরিতোষ প্রায় আমার সমান, হয়তো কিছু বড়ো। কিন্তু মানসিকতায় এখনো তেমন পোক্ত হয়নি। না হলে বুঝতে পারতো নিরাপত্তা এর আগেও আমার কিছু কম ছিলো না এবং তখনো আ ম 'একা মেয়েমানুষ' হয়ে উঠিনি! তা হোক, পরিতোষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। মহীতোষের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটলেও গত একটা বছর সে-ই ছিলো আমার নির্ভর, আমার অবলম্বন, আমার দুঃখ-সুখের একমাত্র সঙ্গী। এরপর হয়তো পরিতোষের সঙ্গে আমার যোগাযোগ শিথিল হয়ে আসবে ক্রমশ। আমি ওর অভাব বোধ করবো। ঠিক জানি না, হয়তো পরিতোষও করবে।

এখনো কিছু গোছগাছ বাকি আছে। আস্তে আস্তে আমাকে সেই কাজগুলো সারতে হবে। না হলে কি করবো!

পরিতোষ চলে যাবার পর থেকেই অবসাদগ্রস্ত আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি এখন থেকে আমার সময় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলো। এই আমি ঘ'ড়িতে ছ'টা দেখলাম। স্নানটান সেরে চায়ের জল ফুটতে দিয়ে ঘরে এসে দেখ'ছি ঘড়ির কাঁটা ছ'টা দশে এসে থেমে আছে। কিন্তু সমস্যা শুধু সময় কাটানো নয়। আপাতত অসহ্য লাগছে নির্জনতা—সেই জাহাজের কেবিনে নিঃসঙ্গ হয়ে থাকা!

কিন্তু, এ-সবই তো আমার জানা ছিলো, নয় কি!

কোর্টের রায় বেরুনোর পরই আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম কাকার আশ্রয়ে আর থাকবো না। সত্যি বলতে, মনের মধ্যে আমি নিজেই কেমন অশক্ত হয়ে পড়েছিলাম দিনে দিনে—সারাক্ষণ পরিত্যক্ত মনে হতো নিজেকে; মহীতোষ আমাকে ছাড়লো না আমি মহীতোষকে, এইরকম একটা নিরুত্তর প্রশ্নে প্রায়ই বিব্রত হয়ে পড়তাম। পারিপার্শ্ব যে আমাকে সন্দেহের চোখে দেখছে এটা বুঝতে কোনোই অসুবিধে হয়নি। বিয়ের পর এমনিতেই আত্মীয়তার ধারণা যায় বদলে: কথাটা সত্যি, রক্তের রঙও যায় পাল্টে। কাকার কাছে এসে ওঠার কিছুদিন পর থেকেই আমি বুঝতে পারছিলাম কাকার ওপর নির্ভর করে ঠিক করিনি। স্বাভাবিক সম্পর্কে ত্রুটি না থাকলেও গোপনে কোথায় একটা দূরত্ব গড়ে উঠেছে আমাদের মধ্যে। যদি বিয়ে না হতো বা বিধবা হয়ে আসতাম, তাহলে কি ব্যাপারটা একই রকম হতো! সম্ভবত না! আমার অস্বস্তি হচ্ছিল, কোর্টের রায় অস্বস্তিটাকে পরিণত করলো সিদ্ধান্তে। আমি চলে এলাম; অসঙ্কোচে, নির্ভাবনায়—হয়তো এই একাকীত্বই শেষ পর্যন্ত আমার কাম্য ছিলো।

কিন্তু হঠাৎই এখন নিজেকে কেমন অসহায় লাগলো। নিজের সৃষ্টি হলেও এই একাকিত্বের কোনো উদ্দেশ্য পেলাম না আমি। কি করবো, আপাতত সেইটেই আমার কাছে বড়ো সমস্যা।

ভাবতে ভাবতে, নিছক কিছু করার জন্যেই, খাটের নিচ থেকে

স্যুটকেসটা টেনে বের করলাম আমি। এতে আছে আমার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র—ছবির অ্যালবাম, কাঠের পুতুল, ব্যাঙ্কের পাশ ও চেক বই, শেয়ার সার্টিফিকেট, কলেজের রেকর্ড, লকারের চাবি ও কিছু গয়নাগাঁটি এবং টিক্‌লুর একটা বাঁধানো ছবি। চলে আসবো জেনে মাত্র গতকাল পরিতোষ ওটা বাঁধিয়ে এনে দিয়েছে। ব্যস্ত থাকার জন্যে আপাতত এগুলোই আমাকে গুছিয়ে তুলতে হবে।

দু' থাক শাড়ির নিচে থেকে প্রথমেই টিক্‌লুর ছবিটা টেনে বের করলাম আমি। গত ফাল্গুনে পাঁচে পা দিয়েছে ও। এখন আষাঢ়। খানিক আগে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমি মেঘ জমতে দেখেছি আকাশে। বৃষ্টি হবে কি না জানি না।

কি জানি কেন, টিক্‌লুর ছবির দিকে তাকিয়ে সমস্ত উৎসাহ চলে গেল আমার। কাঁচের ওপর আলতো আঁচল বুলিয়ে ছবিটা রেখে দিলাম আমি। স্যুটকেশ বন্ধ করলাম।

শুনেছি যে-সব ছেলে মার আদল পায় তারা নাকি ভাগ্যবান হয়। টিক্‌লু কেমন হবে জানি না। আপাতত দূর থেকেই আমি ওর মঙ্গল কামনা করলাম। টিক্‌লু, সোনা আমার, মা তোমাকে কিছুই দিতে পারেনি। এ-সবই আমার ভুল, আমার ভাগ্য। তুমি ভালো থেকো। আর, যদি পারো, মনে রেখো মাকে।

না, এতোটা ভালো নয়। আবেগ আমার গলা পর্যন্ত উঠে এলো, চোখ জ্বালা করতে লাগলো। নিরর্থক বুঝে সঙ্গে সঙ্গে শাসন করলাম নিজেকে। ঠিক জানি না, হয়তো অনেক দুঃখ পড়ে রইলো আমার জন্যে—ভুতুড়ে বাড়ির অন্ধকার ঘরগুলোয় এখন বাদুড়ের ডানা ঝাপ্টানোর শব্দ শুনছি। আজ টিক্‌লুর জন্যে ভাবছি, হয়তো একদিন মহীতোষের জন্যেও ভাববো। একটা অবর্ণনীয় তিক্ততার অভিজ্ঞতা পেরিয়ে এলাম। অথচ, আলাদা করে ভাবলে, বিচ্ছেদ ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য লাগে।

বিচ্ছেদের ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত শিশুদেরই কাল হয়। সেদিক থেকে

বরং আমি নির্ভাবনায় আছি। টিকলু তার বাবা মাকে চেনে; কিন্তু, যাকে টান বলে, ওর সে-রকম কিছুই হয়নি। ছোটো থেকেই ও আলাদা।

টিকলুর এক বছর বয়স পর্যন্ত আমরা ছিলাম একান্নবর্তী হয়ে, শ্বশুর-বাড়িতে। ও হবার পর থেকেই ব্যবসায় সফল হতে শুরু করেছিলো মহীতোষ। আমি লক্ষ করেছি, ক্রমশই দুরন্ত হয়ে উঠছে মহীতোষ—সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিলো সৌখিন হবার নানা উপসর্গ। ওদের সংসারে আমি তখন নতুন। মহীতোষকে পুরোপুরি জানবার আগেই টিকলু এসেছিলো পেটে, যৌবনের সবচেয়ে নিভৃত ফসল। ভালো-মন্দর তারতম্য বুঝতে শিখলেও পুরোপুরি নির্ভর করতাম স্বামীর ওপর। মহীতোষ সাংসারিক দায়িত্ব এড়ালো না। কিন্তু উঠে এলো নতুন ফ্ল্যাটে।

আমি খুশিই হয়েছিলাম। সবকিছু নিজের করে পাওয়া, সম্পূর্ণের অধিকার অর্জন করা, নিষেধের বেড়া ডিঙনো—সেই পরিবর্তনের মুখে এগুলোই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিলো আমার কাছে।

আরো একটা কারণ ছিলো। বিয়ের পর থেকেই একটা ধারণা শিকড় ছড়াতে শুরু করেছিলো আমার মনে: বিয়ে আমার অতীত পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে আমাকে। উৎসাহ থেকে হঠাৎই কেমন এক ক্লিন্নতায় জড়িয়ে পড়লাম আমি—এক নিয়মানুগ শূন্যতার মধ্যে, যেখানে কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই উঠতে হয় বিছানা ছেড়ে, বিশেষত মেয়েদের; যেখানে পুরুষেরা অফিসে যেতে ব্যস্ত বা কাজে; দুপুর হলেই যেখানে ফেরিওলার ডাকে বেজে ওঠে নিস্তব্ধতা। যেখানে সন্ধ্যা ও রাত হয় সন্ধ্যায় ও রাতে। এর কোনোটাই আমার ওপর চাপানো হয়নি। কিন্তু পরিবেশের চুম্বক এড়াবো কি করে! ছোটো থেকে বড়ো, পুরুষ ও মেয়ে, একই সাবান ভাগাভাগি করে গায়ে মাখতে মাখতে কেমন নিরাবয়ব মনে হতো নিজেকে। এখন বুঝতে পারি, যে-সংসারে আমি ছিলাম—যে-পরিবেশে, সেখানে কোনোদিনই দু' পায়ের পাতা এক করে রাখিনি।

আলাদা হয়ে আসা এক হিসেবে শাপে বর হয়েছিলো আমার পক্ষে। আমি থাকলাম চাকর ও বাবুর্চি পরিবৃত হয়ে নিজস্ব সংসারে—যাকে বলে ছিমছাম হয়ে থাকা। সাতটার আগে কোনো-দিনই আমার ভোর হয় না; দেড়টা দুটো না বাজলে রাতকে রাত বলে মনে হয় না। এর জন্যে আমার কোনো আক্ষেপ ছিলো না। গোড়ার দিকে সঙ্গে এনেছিলাম টিক্‌লুকে। দামী আয়া রাখলাম ওর দেখাশোনার জন্যে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই টের পেলাম, ওইটুকু সন্তান যে মার, ছিমছাম হয়ে থাকা তার পক্ষে কিছু-না-কিছু অসম্ভব। আমার মধ্যে দুটো আলাদা সত্তা মেতে উঠলো দ্বন্দ্বে, ক্রমশ জোরালো হতে লাগলো। একজন, যে চায় সেজেগুজে পরিপাটি হয়ে পার্টিতে বেরুতে—স্বামীর যোগ্য হয়ে উঠতে; আর একজন, যে চায় ফিরে যেতে, একটি শিশুর কাতর মুখ যার হাসিকেও করে দেয় অন্যমনস্ক।

বেশ কিছুকাল এই দোটানায় ছিন্নভিন্ন হতে থাকলাম আমি। শেষ পর্যন্ত মহীতোষই উপায় বের করলো। ওর তখন টিক্‌লুর চেয়ে আমাকেই বেশি দরকার—যে-আমি সুন্দরী, বাক্‌পটু আর উচ্ছল, সামাজিক আলাপে 'গেম্'। টিক্‌লু চলে গেল তার ঠাকুমার কাছে, পিসী ও কাকাদের আদরের মধ্যে।

এটা আমার দ্বিতীয় ভুল। হয়তো মারাত্মক ভুল।

এই ভুল শোধরাবার শেষ চেষ্টা করেছিলাম মহীতোষের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর, গত বছর, যখন আমি কাকার কাছে উঠে এসেছি। আমি দাবি করলাম টিক্‌লুকে। কি জানি কেন, মহীতোষও কোনো বাধা দেবার চেষ্টা করেনি।

টিক্‌লু এলো, আল্‌গা ও অস্পষ্ট হয়ে। দু'চার দিনের মধ্যেই লক্ষ করলাম আমি, মাকে ও মা বলে ডাকছে, ঘুরঘুর করছে আশেপাশে, চাইছে এটা ওটা সেটা। আমার ভালো লাগলো। বাজার উজাড় করে আমি ওর জন্যে কিনে আনলাম নতুন নতুন জামা কাপড় আর

খেলনা। কিন্তু, যখন এ-সব কিছুরই দরকার ছিল না ওর, শৈশবের সেই দিনগুলির অপরিচয় পেরিয়ে কিছুতেই ও আমার কাছাকাছি পৌঁছুতে পারলো না। মার, হয়তো বাবারও, আচ্ছন্ন ছবি থেকে ঢের দূরে নিজের মনেই তখন ও নিজের জগৎ সৃষ্টি করে নিয়েছে।

টিক্‌লু যেদিন ফিরে গেল, সেদিনই আমি আমার ভবিতব্য জেনে নিয়েছি। আমি একা।

দুই

বিকেল ও সন্ধ্যের স্তব্ধতার পর আবার কিছু শব্দ আমার কানে আসছিলো। রাস্তা দিয়ে লোকজন যাচ্ছে কথা বলতে বলতে, রিক্সা যাচ্ছে, সজোরে ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করা ও মীটার নামানো—এইসব শব্দ। কাছাকাছি কোনো বাড়িতে রেকর্ডের গান শুরু হলো—'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া'ই হবে, কথাগুলো স্পষ্ট না হলেও সুরটা চেনা লাগলো। এইসব শব্দ ও কোলাহল জাগিয়ে দিল আমাকে। অনেকক্ষণ আমি এইসব শব্দের অপেক্ষায় ছিলাম।

এমনও হতে পারে এটা কল্পিত ব্যাপার। গতানুগতিকতায় ছেদ পড়েনি কোনো ; নিজের মধ্যেই অনেকক্ষণ ধরে স্তব্ধ হয়ে ছিলাম আমি।

খিদে পাচ্ছিলো। নতুন কেনা বিস্কুটের প্যাকেট ছিঁড়ে ছুটো বিস্কুট খেয়ে নিলাম। ইচ্ছে, এরপর আর একবার চা খাবো। নাকি কফি ? এগুলো সাধারণত লোকে অন্যকে জিজ্ঞেস করে : কি খাবেন ? চা, না কফি ? সপ্রতিভ হবার মুখে বাড়িতে অতিথি বা বন্ধুবান্ধব এলে মহীতোষ জিজ্ঞেস করতো, ব্র্যাণ্ডি অর হুইস্কি ? মন বুঝে আমাকেই বোতল উপুড় করতে হতো গ্লাসে। এক একদিন নিজেও চুমুক দিয়ে দেখেছি, ভালোমন্দ বুঝিনি তেমন। এটা করতে হতো। এখন আমি নিজেকেই জিজ্ঞেস করছি নিজে।

আবার গ্যাস জ্বেলে ফিরে এলাম ঘরে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে হাত থামিয়ে, ঠোঁট উল্‌টে ও চোখের পাতা টেনে দেখলাম। নাকের পাটায় ঘামের বিন্দু জমেছিলো, মুছে নিলাম আঙুলে। গলায় হাত বুলোলাম। বুক থেকে আঁচল সরিয়ে একবার সামনে এগিয়ে, তারপর পিছনে সরে গিয়ে দাঁড়ালাম, দেখলাম নিজেকে। হঠাৎই সিঁথির দিকে তাকিয়ে খেয়াল হলো অনেকদিন

সিঁদুর পরি না। প্রায় বছরখানেক। চিন্তাটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। জলে জল আসার মতো অনায়াসে ও পরপর কতকগুলো চিন্তা আমার মাথায় এলো, যেমন, রাত্রে বিছানায় শুয়ে মহীতোষ আমার কথা কিছু ভাবে কি না, বা, বিচ্ছেদের পর মহীতোষ আবার নতুন করে কিছু করার কথা ভাবছে কি না। এ ভাবনাটাও স্থায়ী হলো না। কারণ, হঠাৎই মনে পড়লো, দিন এগিয়ে আসছে, কাল বা পরশু বাজারে বেরুলে স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনতে হবে। পরিতোষকে দেওয়া কেনাকাটার ফর্দে ওটা ছিলো না। পরে নিজেও ভুলে গেছি।

সাতটা বেজে গেল। পরিতোষ যাবার পর দ্বিতীয়জনবিহীন এই ফ্ল্যাটে কি করে দু'তিন ঘণ্টা সময় কেটে গেল জানি না। খানিক আগে মনে হচ্ছিলো সমস্তই চলছে ঠিকঠাক, শুধু আমিই থেমে আছি ; একা। এখন মনে হচ্ছে, না ভাবনারও একরকম গতি আছে—সে চলছে, ক্রমাগত, গোপনে ও নিঃশব্দে। শীতের নদীর সামনে দাঁড়ালে চোখে পড়ে গতিহীন স্তব্ধতা, অনেকটা সেইরকম। দু'তিন ঘণ্টা খুব কম সময় নয়।

কিন্তু দু'তিন ঘণ্টাই কি আমার সমস্যা! এর পর আমি কি করবো ?

ইচ্ছে করলেই এখন বেরুনো যায়। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরা ও ঘুমোনো। যদি ঘুমোতে পারি, কাল থেকে আবার নতুন করে ভাবা যাবে। আর যাই করি, নিজের হাতে নিজের জন্যে আজ আর রাঁধছি না। বাড়িঅলা বলেছেন কাল বা পরশুর মধ্যে একজন লোক পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে কিছু দরকার পড়লে তাঁকে যেন জানাতে সঙ্কোচ না করি।

কি করবো না করবো ভাবতে ভাবতে নতুন করে অবসাদ ছেঁকে ধরছিলো আমাকে। কিছু না ভেবেই রেডিওটা খুলে দিলাম আমি। খবর পড়া শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কোন্ জনসভায় দেশের দারিদ্র্য মুক্তির জন্যে জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে বলেছেন, বেতারের

সংবাদ-পড়ুয়া তাই বলে চলেছেন থিয়েটারী গলায়। বিরক্ত হয়ে বন্ধ করে দিলাম। পৃথিবী চলছে কতগুলো শব্দের পায়ে ভর করে, যেমন 'দারিদ্র্য', যেমন 'মুক্তি', যেমন 'জনসাধারণ' যেমন 'এগিয়ে চলো'। এর কোনোটার সঙ্গেই আমার কোনো সম্পর্ক নেই। ঠিক এই মুহূর্তে সময় কাটানোই আমার প্রথম ও শেষ সমস্যা। বেরুবো ভাবলেও নিছক সময় কাটানোর জন্যেই বেরুতে ইচ্ছে করছে না। অস্বস্তি-ও-বিরক্তিকর সবকিছু। হতাশ হয়ে টেবিলের ওপর থেকে একটা ম্যাগাজিন কুড়িয়ে সোফায় এসে বসলাম।

চুপচাপ বসে অন্যমনস্ক হাতে কতোক্ষণ পাতা উল্টেছি জানি না, হঠাৎ মনে হলো, ঠিক আমার ঘরের দরজার বাইরে আস্তে আস্তে একটা জুতোর শব্দ এগিয়ে আসছে। ম্যাগাজিনটা পাশে সরিয়ে রেখে শক্ত হয়ে বসলাম।

আমার ভুলও হতে পারে। ফ্ল্যাটের দরজার পাশে কোলপসিবল্ গেট পেরিয়ে উঠে গেছে দোতলার সিঁড়ি—ওখানে বাড়িঅলা থাকেন সপরিবারে, হয়তো তাদেরই কেউ। জুতোর শব্দ স্পষ্ট হতে আমি ভাবলাম এইবার শব্দটা সিঁড়ির দিকে এগোবে। কিন্তু, বিশ্বাস করা যায় না, শব্দটা থেমে গেল আমারই দরজার সামনে এসে, থেমে থাকলো। বুকের ভিতর স্তব্ধ হয়ে এলো নিঃশ্বাস। তার পরেই পরিষ্কার, যান্ত্রিক শব্দে কলিং বেল বেজে উঠলো।

হয়তো পরিতোষই ফিরে এসেছে আবার, আমি ভাবলাম। পরক্ষণেই মনে হলো বিকেলের পর পরিতোষের আবার ফিরে আসার কোনো কারণ নেই। আমি নিশ্চিত জানি, আজ নয়, কালও নয়, হয়তো বেশ কিছুদিন এখন আর পরিতোষ আসবে না।

যে-ই এসে থাকুক, এখন উঠে গিয়ে দরজাটা খোলা উচিত আমার। তবু এক ধরণের সঙ্কোচ ও সন্দেহ আমাকে পেয়ে বসলো। অবিশ্বাস্য বলেই সম্ভবত আগন্তুকের আবির্ভাব কিছুক্ষণ স্তব্ধ করে রাখলো আমাকে। আবার বেলের শব্দ হতে তাড়াতাড়ি ভিতরের

ঘরে গিয়ে শাড়ি গুছিয়ে চুলের সামনেটা পরিপাটি করে ফিরে এলাম ও কম্পিত হাতে দরজা খুললাম।

অচেনা কেউ নয়। নড়তে না পারলেও বিস্ময় ও উত্তেজনা থিতিয়ে এলো আস্তে আস্তে। ঘাম ফুটে উঠলো কপালে ও গলায়।

'কি, খুব অবাক হচ্ছো তো ?'

'তুমি !'

মনীশ হাসলো গাল ছড়িয়ে। টাইয়ের নট্ আল্‌গা করতে করতে বললো, 'যে-ভাবে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছো, মনে হচ্ছে প্রবেশ নিষিদ্ধ।'

'আরে, এসো এসো। বসো।'

ঘরে ঢুকে সোফায় বসলো মনীশ, ঈষৎ গা এলিয়ে। দরজাটা বন্ধ করে দিলাম আমি। মনীশ তখনো হাসছে।

আমি খুশিই হলাম। কিন্তু অস্বস্তিটা গেল না। এখন মনীশকে দেখে প্রথমেই আমার যা মনে হলো তা হলো মনীশ কেন এলো ও কি করে এবং কতোক্ষণ থাকবে। ভালোই হয় যদি ও অনেকক্ষণ থাকে—রাত দশটা কি এগারোটা পর্যন্ত, আমি শুতে যাবার আগে পর্যন্ত। আপাতত ঘণ্টা কয়েকের জন্যে আমি নিশ্চিন্ত।

তাকিয়ে তাকিয়ে ঘর দেখছিলো মনীশ। আমি মনীশকে। অল্প ক্লান্ত দেখাচ্ছে ; তাহলেও আগেকার মতো আজও ওকে সুপুরুষ বলতে দ্বিধা নেই। লম্বা, সবল চেহারা ; চওড়া কপালে ব্যক্তিত্বের আভাস। মহীতোষের পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে, কি জানি কেন, মনীশকে আমার বারবারই একটু আলাদা ও অন্যরকম মনে হয়।

ঘর ও আসবাবের ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে মনীশ আমার দিকে তাকালো।

'ফ্ল্যাটটা ভালোই পেয়েছো—'

আমি হাসলাম। মনে মনে ঈষৎ চিন্তিতও যে হলাম না তা নয়। এই পরিবেশে ঠিক কিভাবে, কোন কথা বলে আলাপ চালানো যায়

বুঝতে পারলাম না। একাকিত্বের বোধটা আবার পিছন থেকে টেনে ধরলো আমাকে।

কথা না পেয়ে বললাম, 'কি খাবে? চা না কফি?'

'এনিথিং।' মনীশ কাঁধ বেঁকালো, 'যা তোমার ইচ্ছে—'

আমি উঠে যাচ্ছিলাম, মনীশ বললো, 'নিজেই করবে নাকি?'

'আর কে করবে!'

'কেন!' সোজাসুজি তাকালো মনীশ, 'লোকজন পাওনি মনে হচ্ছে—'

'আজই তো এলাম।' আমি বললাম, 'কাল পরশুর মধ্যে একটা লোক পেয়ে যাবো।'

'তাহলে বসো এখন। চা কফি পরে হবে—'

আবার নৈঃশব্দ্য ছড়াতে শুরু করলো। নৈঃশব্দ্য, আগুনের মতো—নাকি ধোঁয়ার মতো, একটু একটু করে ঘিরে ফেলে সবদিক থেকে। পরিত্যক্ত ম্যাগাজিনটা হাতে তুলে নিয়ে মনীশ এখন পাতা উল্টে যাচ্ছে। ঘরে ঢোকার সময় একরকম স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ করেছিলাম ওর চলাফেরা ও কথাবার্তায়। সম্ভবত আমার স্তব্ধতা লক্ষ করে চুপ করে গেছে। অতিথি হিসেবে গণ্য করলে ওকে স্বাভাবিক রাখা আমারই দায়িত্ব।

কিন্তু চিন্তা সত্ত্বেও, ওর প্রতি কোনোরকম নৈকট্য অনুভব করলাম না আমি। ধোঁয়াটা কুয়াশার মতো ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত চেতনায়। আমি বুঝতে পারছি না কি করবো, কি করা উচিত। খানিক আগে পর্যন্ত দ্বিতীয় জনের অভাব আমাকে অসহায় করে তুলেছিলো। কিন্তু, এখন, মনীশের উপস্থিতি সত্ত্বেও দুরূহ জড়তা আমাকে ধরে রাখলো।

এই স্তব্ধতা অসহ্য। আমার ভয় হলো, এভাবে চললে মনীশ হয়তো এক্ষুনি চলে যাবার কথা ভাববে। আমি আবার একা হয়ে পড়বো। বিকেল থেকে এখন পর্যন্ত একটা দীর্ঘ, ক্লান্তিকর উপন্যাসের

মতো আমি শুধুই পাতার পর পাতা বর্ণনায় প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছি, নতুন পরিচ্ছেদ শুরু হলো, কিন্তু শুরুর লাইন থেকে এক পা'ও এগোইনি !

মনীশ সিগারেট জ্বালাতে আমি সাড় ফিরে পেলাম। আড়ষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে এসেছি খবর পেলে কি করে ?'

'তুমি নিশ্চয়ই জানাওনি !' মনীশ কথাটা লুফে নিল। তারপর বললো, 'সকালে পরমেশের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওই বললো। তুমি তো অনেককেই জানিয়েছো—'

কথার খোঁচটুকু আন্দাজ করে বললাম, 'তুমি দিল্লীতে আছো না ফিরেছো জানি না। জানলে তোমাকেও খবর দিতাম।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, ম্যাডাম।' সিগারেটটা নিবে গিয়েছিলো। আবার লাইটার জ্বেলে, ধোঁয়া বের করলো মনীশ। 'আর কেউ এসেছিলো নাকি ?'

'না।' পরে বললাম, 'তুমিই প্রথম—'

'জীবনে কোনো ব্যাপারে ফার্স্ট হইনি, নমি।' গলা ছেড়ে হাসলো মনীশ, 'তবু একবার হলাম।'

আমি বললাম, 'বসো। কফিটা করে আনি।'

এ-ছাড়া আর উপায় ছিলো না। স্পষ্ট বুঝতে পারছি কথা বলার স্থৈর্য আমার কমে আসছে। মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায় কলের মুখ, জল পড়ে চুঁইয়ে, চুঁইয়ে অনেকটা সেইরকম—একটা কথার সঙ্গে পরবর্তী কথার দূরত্ব অপরিসীম বোধ হলো আমার। এর কারণ কি জানি না। হয়তো সঙ্গ, অবলম্বন, নির্ভরতা এরাই সৃষ্টি করে কথা। এ-সব হারিয়ে ক্রমশ মূক হয়ে পড়ছি আমি।

গ্যাস জ্বেলে, কফির জল চাপিয়ে, দাঁড়িয়ে থাকলাম চুপচাপ। মহীতোষের কথা মনে পড়লো—প্রায় ছ'বছর কিংবা আরো কিছু বেশিদিন আমরা একসঙ্গে ছিলাম। এই ছ' বছরের সব স্মৃতিই তিক্ত নয়। বরং, বিচ্ছিন্ন করে ভাবলে, আমার স্মৃতিতে মহীতোষের

মুখচ্ছবি কোথাও ম্লান নয়। মনে পড়ে গোড়ার দিকের সেইসব দিন ও বছরগুলির কথা, যখন আমরা ছিলাম একাত্ম; যখন পারিবারিক সম্পর্ক থেকে দূরে মহীতোষকে সফল করার দিকেই আমার উৎসাহ ছিলো বেশি। আজকের মনীশ ও অন্যান্যরা—পরমেশ, বিভাস, শেখর, মিঃ সরকার, অভিজিৎ, উৎপল এবং আরো অনেকে—এসেছে তারপর। এসেছে এদের স্ত্রী ও মহীতোষের বান্ধবীরা। মহীতোষকে বাদ দিয়ে এদের কথা আমি ভাবতে পারি না।

তবু একা হবার মুহূর্তে আমি এদের ভুলতে পারিনি। মহীতোষের সঙ্গে একাত্ম হবার প্রবণতায় অতীত ও ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলো শিথিল হয়ে এসেছিলো ক্রমশ। পরে, যখন দরকার পড়লো, খুঁজতে গিয়ে দেখলাম, আংটির খুদে খুদে পাথরের মতো অলক্ষে সবাই গেছে হারিয়ে, দূরে; নতুন করে শুরু করা বৃথা। হয়তো একেই বলে ভাগ্য। মহীতোষকে বাদ দিলেও ওর সংস্পর্শ ও পরিবেশকে নতুন করে আঁকড়ে ধরলাম আমি।

হয়তো একটু বেশিই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। মনীশ আছে এবং অপেক্ষা করছে এই তথ্যটুকুও গিয়েছিলাম ভুলে। সম্বিৎ ফিরলো মনীশের গলায়।

'পারমিশান না নিয়েই চলে এলাম; কিছু মনে করো না।' মনীশ বললো। ও এখন আমার খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে।

মুহূর্তে থেমে এলো নিঃশ্বাস। স্বল্পায়তন কিচেনের মধ্যে এখন মনীশ এবং আমি খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে—ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করেই সরে দাঁড়ালাম আমি। তারপর দ্রুত হাতে কফিতে চামচ নেড়ে কাপটা তুলে দিলাম ওর হাতে।

'প্রাইভেসি থাকলে পারমিশান লাগে। আমার আর কি আছে এখন! প্রায় ব্যাচেলর বলতে পারো।'

'হ্যাঁ। কিন্তু অনভিজ্ঞ ব্যাচেলর।' মনীশ হাসলো। 'তোমার বেডরুম দেখে তো তাই মনে হলো।'

'বেডরুমও দেখে এসেছো!'

'দেখতে হলো।' কফিতে চুমুক দিল মনীশ। জিভে স্বাদ নিয়ে বললো, 'চিনি কি একটু বেশি দিয়েছো?'

'এক চামচ। কেন! আরও কম খাও?'

'না, এক চামচই।' মনীশ হাসলো, 'গ্লাস তোমার হাতে তৈরি। ওটা বোধহয় হিসেবের মধ্যে ধরোনি!'

আমি একটু কাঁপলাম। হয়তো অকারণে—পুরনো সেতার আকস্মিক হাওয়ায় কখনো কখনো বেজে ওঠে। মনীশ ততোক্ষণে বসার ঘরের দিকে রওনা দিয়েছে। শাড়ির আঁচলটা গুছিয়ে নিয়ে আমি ওকে অনুসরণ করলাম।

চা বা কফিতে আমি তেমন অভ্যস্ত নই। অথচ এই নিয়ে আজ বিকেল থেকে তিন বার হলো। জিভে অরুচি বোধ করায় কফিটা শেষ না করেই কাপটা নামিয়ে রাখলাম টেবিলে। মনীশ আমাকে লক্ষ করছে খেয়াল করিনি। চোখাচোখি হতে চোখ নামিয়ে নিলাম আমি।

ওই অবস্থাতেই টের পেলাম প্যাকেটের ওপর সিগারেট ঠুকছে মনীশ। লাইটার জ্বালার শব্দও কানে এলো। বাকি সব স্তব্ধ। নিশ্চিত এর মধ্যে—মনীশ আসার পর—আমরা অনেকটা সময় পার করেছি। কথাও বলেছি কিছু কিছু। কিন্তু, নিজেকে চোখ ঠেরে লাভ নেই, সে-সবই নিজের সঙ্গে কথোপকথন চালানোর মতো, বিকল্পহীন ও অস্পষ্ট। ভিতরের অসহিষ্ণুতা পরিষ্কার চাপ দিচ্ছে আমার স্নায়ুর ওপর। মনীশ চলে গেলেই হয়তো এখন আমি খুশি হবো। কিন্তু, একই সময় ভাবলাম, এখনো রাত হতে অনেক দেরি—অবসাদগ্রস্ত স্নায়ুগুলোকে শিথিল করে অন্ধকার বিছানায় এলিয়ে পড়ার আগে এখনো আমাকে বিপুল সময় পার হতে হবে। জানি না, আজও হয়তো আমাকে ঘুমের ওষুধ খেতে হবে। সে-জন্যে অসুবিধে নেই কোনো। আশঙ্কার শুরু থেকেই উদ্যোগ সেরে রেখেছিলাম আমি—পরিতোষকে দিয়ে আগেই এক ফাইল ট্যাবলেট আনিয়ে রেখেছি।

পরিতোষ আপত্তি করেছিলো। বারবারই সে আমাকে দুর্বল ভাবে, ভাবে খামখেয়ালি। প্রেসক্রিপসনটা হাতে নিয়ে বলেছিলো, 'তুমি একটা কেলেঙ্কারী না করে ছাড়বে না দেখছি। ঘুম না এলে জেগে থেকো ; এক দু' দিনের ব্যাপার। না ঘুমিয়ে যাবে কোথায়!'

'না হয় একেবারেই ঘুমোলাম। তুমি আছো, টিকলুকে দেখবে।'

আবেগ মাঝে মধ্যে পরিতোষকে বশ করে ফেলে। এটাও ওর ছেলেমানুষী।

'যা করার নিজেই করো।' বলেছিলো, 'আমাকে কেন জড়াচ্ছো!'

শুধু ওকেই নয়, জড়াতে আমি সকলকেই চাই। পরিতোষকে বোঝাতে পারিনি, বাঁচতে আমার বড়ো লোভ হয়, ইচ্ছে করে আরো অনেক, অনেকদিন ধরে বাঁচি। সময়ের ভার অসহ্য না হলে, দেখো, সত্যিই আমি আরো অনেকদিন বেঁচে যাবো। এ-সব ইচ্ছের কথা মুখ ফুটে বলা যায় না।

'কী অতো ভাবছো বলো তো!'

'কিছু না।' চেষ্টা করে হাসলাম আমি। 'তোমার খবর বলো সোমা কেমন আছে?'

'বাপের বাড়িতে তো মেয়েরা ভালোই থাকে।' মনীশ বললো, 'এসে চিঠি পেলাম, আরো কিছুদিন থাকতে চায় লিখেছে। থাকুক। কলকাতার একঘেঁয়েমি কার আর ভালো লাগে!'

'তা ঠিক।' আমি বললাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবলাম, পরবর্তী আলোচনার জন্যে আবার আমাকে কথা খুঁজতে হবে।

মনীশ উঠে দাঁড়ালো। থমকে, থেমে, ধীরে-সুস্থে চলাটা ওর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তবু অনেকক্ষণ, অন্তত আধঘণ্টা, স্বভাবের বিরুদ্ধে নিজেকে চালিয়ে নিয়ে গেছে ও। আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ।

বিক্ষিপ্তভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে টেলিফোনের সামনে এসে দাঁড়ালো মনীশ।

'একটা ফোন করবো?'

'লাভ নেই।' আমি বললাম, 'ওটা নামেই টেলিফোন। এতোদিন কাটা ছিলো। কাল হয়তো কানেক্‌সন পাওয়া যাবে।'

'তাহলে কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলছো! ও, কে। নো প্রব্লেম।'

উর্ধ্বে হাত ছুঁড়লো মনীশ। ঘাড়টা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

'নমি, তুমি এখন কি করবে?'

'কি আর করবো!' আমি হাসলাম জোর করে। 'তুমি কি চলে যাচ্ছো?'

ঠিক জানি না, আমার গলায় হয়তো অসহায়তা ফুটে উঠেছিলো। দূর থেকেই আমাকে লক্ষ করলো মনীশ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, পুরুষমানুষের এ-রকম চাহনি আমাকে ভাবনায় ফেলে। তারপর সামনে এসে দাঁড়ালো।

'কাম অন্। বাইরে কোথাও খেয়ে আসি। আমিও আজ একা।'

'কি দরকার! আমি না হয়—'

'কাম অন্!'

মনীশ আমার দিকে ঝুঁকে এলো। আমি জানি এখন আমার কোনো প্রতিরোধ নেই। তাছাড়া, মনীশ ব'লে নয়, মনে মনে বুঝছি, যে-কারুর ডাকই এই মুহূর্তে আমার পক্ষে এড়ানো সম্ভব হতো না। বাইরের রাস্তা, মানুষজন ও সচল কর্মপ্রবাহ থেকে দূরে, মনে হলো, বহুকাল আমি একা পড়ে আছি। এখনকার মতো একটা ব্যবস্থা হলো, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত—আমি জানি না কাল কি হবে বা পরশু বা পরবর্তী অন্যান্য দিনগুলোয়। আত্মরক্ষার জন্যেও অন্তত এই মূল্যবান মুহূর্তটিকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি না।

'একটু বসো।' মনীশকে বললাম, 'আমি তৈরি হয়ে আসি।'

বেডরুমে গিয়ে আমি প্রথমেই আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। প্রসাধনহীন মুখের সর্বত্র বিষাদের ছায়া। দু'বছর আগে আমি যা

ছিলাম তার সঙ্গে আমার আজকের রূপের পার্থক্য অনেক। গভীর অসুখে ভুগে ওঠার পর ত্বকের মসৃণতা যায় নষ্ট হয়ে, শরীর হয়ে পড়ে কৃশ, স্মৃতির ক্লেশ ছায়া ফেলে চোখে। এটা কোনো অসুখ কি না জানি না, কিন্তু, আয়নায় তাকিয়ে এখন আমি সেই স্মৃতির ছায়া দেখতে পেলাম। বিশেষত চোখে। শরীর ও দৃষ্টির মধ্যে এমন দূরত্ব সচরাচর চোখে পড়ে না। দিন যাবে, হয়তো এই দূরত্ব আরো বাড়বে। বুকের মধ্যে কোলাহল করতে করতে নিঃশ্বাস উঠে এলো আমার গলা পর্যন্ত।

শাড়িটা তাড়াতাড়ি খুলে ফেললাম আমি। ব্লাউজের বোতামে হাত দিয়ে থেমে দাঁড়ালাম, তাকালাম দরজার দিকে। ভাবলাম। তারপর আস্তে হেঁটে গিয়ে ছিট্‌কিনি তুলে দিলাম দরজায়। নিঃশব্দে।

ব্লু আমার ফেভারিট রঙ। পছন্দসই শাড়ি পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতি আকস্মিক সম্মোহে কেমন মূক হয়ে গেলাম আমি। নিজেকে এখন যথেচ্ছ ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। আমি খুশি হলাম এই ভেবে যে আপাতত সাধ্যমতো বিষাদের ভাবটা আমি কাটিয়ে উঠতে পেরেছি এবং এর জন্যে আমাকে বিশেষ কোনো পরিশ্রম করতে হয়নি। তবু একটু খুঁত লাগছিলো; পূর্ণতার কাছাকাছি এসেও আমি ঠিক ধরতে পারছি না তাকে। কানে মুক্তোর ঝোলানো দুলটা পরতেই খুঁতটা গেল। মুক্তোর লকেটটা পরে নিলাম গলায়। গত একটা বছর এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে আমি ছিলাম নিশ্চেষ্ট। হয়তো কথাটা ঠিক নয়। আমি কি নিজের সম্পর্কেই সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলাম না!

নিজেকে গুছোতেই অনেকটা সময় গেল। বুকের কাছে ব্লেভ্‌ল্ঁ মিস্ট্‌ স্প্রে করে বেরিয়ে আসতে আসতে মনে হলো মনীশের নিশ্চয়ই আমাকে পছন্দ হবে। যখন যে-পুরুষের সঙ্গে থাকবে তার মনের মতো করে সাজাবে নিজেকে, মেয়েদের সম্বন্ধে এ-কথাটা কে

বলেছিলেন মনে নেই, তবে আকস্মিকভাবেই কথাটা মনে পড়ে গেল আমার। মনীশের জন্যে না হোক, অপরিবর্তনীয়তার সঙ্গে যুদ্ধে আমি যে এক পা এগোতে পেরেছি, আমার অব্যবহিত সত্তা থেকে বের ক'রে আনতে পেরেছি নিজেকে—আপাতত এই চিন্তাই আমাকে কিছুটা খোলামেলা করে দিল।

ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে মনীশ তখনো পায়চারি করছে। আমাকে দেখে থেমে দাঁড়ালো।

'খুব দেরি করলাম!' কণ্ঠস্বরে সঙ্কোচ লুকোতে পারলাম না।

'করেছো।' একটু থেমে বললো মনীশ, 'এখন মনে হচ্ছে দেরি করে ভালোই করেছো। তোমাকে রানীর মতো দেখাচ্ছে।'

'ঠাট্টা করো না মনীশ!' লুকিয়ে যতোটা দেখা যায় দেখে নিলাম নিজেকে। রানীর মতো—অনেকদিন এ-রকম কথা শুনিনি। প্রতিধ্বনি আড়াল করে আমি বললাম, 'চলো।'

দরজা লক্ করে প্রায়ান্ধকার বারান্দায় এক মুহূর্ত মুখোমুখি দাঁড়ালাম আমরা। টের পেলাম ক্রমশ দ্রুত হয়ে আসছে নিঃশ্বাস, বিশেষ একটি শব্দের অনুরণন কিছুতেই থামাতে পারছি না আমি। অসম্ভবের প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই আমার—আমি জানি এই মুহূর্তে নিজের কাছ থেকে দূরে থাকা ভিন্ন আমার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। এই ভেবে নিজেকে নিরস্ত করলাম আমি।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিলো। আমাকে গাড়িতে উঠতে দিয়ে নিজে উঠলো মনীশ। গাড়ি ষ্টার্ট করে বললো, 'সত্যি, নমি, আমি ভাবছি আট বছর আগে কেন তোমার সঙ্গে দেখা হলো না!'

আমি চুপ করে থাকলাম। অতীত নিয়ে এখন আর আমি ভাবি না। মনীশের কথার জবাব দেবার কোনো দায়িত্ব অনুভব করলাম না। কাল বা পরশু বা তার পরের দিন বা তারও পরের দিন কি হবে জানি না। অগত্যা বৃষ্টি-ভেজা চকচকে পিচের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আমি শুধুই অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলাম। কতো সহজে মিশে

যেতে পারলাম মনীশের সঙ্গে! ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য দেখে এখন যে-কেউ আমাদের স্বামী-স্ত্রী ভাবতে পারে, অন্তত ঘনিষ্ঠ ভাবতে কোনো অসুবিধে নেই।

সম্পর্কটি সেইরকম হলে আমি নিজেই খুশি হতাম সবচেয়ে বেশি। স্বামী হারানো মানে পুরুষকে হারানো। মনীশই বা কি আর এমন কম পুরুষ! কিন্তু, এর সবটাই বাইরের সখ্য, ছায়ার সংস্পর্শ, যা দিয়ে ভিতরের দূরত্ব ঘোচানো যায় না।

মহীতোষের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি রকম ছিল? ঠিক ধরতে পারি না। বলতে কি গত ছ' বছরের গোটা ইতিহাসটা এখনো আমার কাছে অস্পষ্ট। গোড়ার দিকের কয়েকটা মাস বাদ দিলে প্রায় সমস্ত সময়টাই মহীতোষ আর আমি স্বামী-স্ত্রী ছিলাম শুধু শরীর ব্যবহারের মধ্যে। যেটা ঘটতো অন্ধকারে—পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকিতে আলো জ্বলে ওঠে। নিভৃতি বা গোপনীয়তা বলতে ওইটুকুই। সকাল থেকে রাত গভীর না হওয়া পর্যন্ত কোনো না কোনো তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকতো আমাদের মধ্যে; আর যে যখন উপস্থিত থাকতো সেই মুহূর্তে তার অধিকারই হয়ে উঠতো বড়ো। কখনো শুধুই একজন, কখনো একসঙ্গে অনেকজন। তৃতীয় ব্যক্তির ছায়া আমাদের অনুসরণ করতো সর্বত্র--সিনেমা দেখতে গেছি, সেখানে, বিবাহ বার্ষিকীতে বা ছুটি-ছাটায় বাইরে বেড়াতে গেছি, সেখানেও। ছিলাম এক, দেখতে দেখতে হয়ে গেলাম বহু।

প্রথম প্রথম সঙ্কোচ লাগতো আমার, অস্বস্তি হতো—রাগে, অসহিষ্ণুতায় ফেটে পড়েছি বহুবার। মহীতোষ আমল দেয়নি। আমার ভিতরের অসামাজিক মানুষটাকে খুন করার জন্যেই তখন তার যতো ব্যস্ততা। নিজেই বুঝতে পারছিলাম, ক্ষোভ থেকেই আমি মেনে নিচ্ছি সবকিছু, এই জীবনেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি ক্রমশ। দেখতে দেখতে চমৎকার ভাবে সামাজিক হয়ে উঠলাম। আমার ব্যবহারে আর কোনো জড়তা নেই, প্রত্যেকটি গ্লাসে সমান মাপে মদ ঢালার

মতো করে মাপা হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করতে পারি সকলকে। পাঁচ মিনিটের পরিচয়েই 'আপনি' থেকে সোজা নেমে আসে 'তুমি'-তে।

তাহলে মনীশের সঙ্গে আমার ব্যবহারে স্বাভাবিকতা থাকবে না কেন! আইনত মহীতোষ আজ আমার কেউ নয়। যখন আইন ছিলো না, শরীরে শরীর ঘষে মাঝে মাঝে কিছু উত্তেজনা সংগ্রহ করা ছাড়া আগেও কি আমাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক ছিলো! মনে তো হয় না। থাকলে আজ হয়তো মনীশের সঙ্গে বেরুবার আগে আমি ভাবতাম, উচিত অনুচিতের দ্বিধা—সামান্য হলেও—নাড়িয়ে দিতো আমাকে।

সে-রকম কিছুই হলো না। মনীশ এলো, ডাকলো, আমি বেরিয়ে পড়লাম। মনীশ না হয়ে যদি আর কেউ হতো, তাহলেও হয়তো এই ঘটনাই ঘটতো।

তবু দূরত্ব দূরত্বই। আত্মীয় সম্পর্ক থেকে দূরে একজন প্রায়-অচেনা পুরুষের সঙ্গে বেরুনোর অস্বস্তিটা ছাড়লো না আমাকে। বুঝতে পারছি আমি ব্যবহার করছি কলের পুতুলের মতো; কথা বলছি, সব কথাই মনীশের কথার উত্তরে। মনীশের চুপ করে যাওয়ার অর্থ আমারও থেমে পড়া। এই লোকটি, মনীশ, আমার গোপন ও ব্যক্তিগত অনেক কিছুরই খবর রাখে, এই ভাবনা সারাক্ষণ আমার স্নায়ুর ওপর চাপ দিতে থাকলো।

সম্ভবত মনীশও আমার অস্বস্তি লক্ষ করছিলো। আমাকে সহজ করে রাখার সব দায়িত্ব নিজেই নিল। কাজটা কঠিন, প্রায় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রিহার্সাল দেওয়ার মতো ব্যাপার। তবু কথার পর কথা তৈরি করতে লাগলো মনীশ; বেছে বেছে এমন সব প্রসঙ্গ তুলতে লাগলো, যাতে আমি সহজেই গলা মেলাতে পারি। স্তব্ধতাকে আমার ভীষণ ভয়, নৈঃশব্দ্যের ভার এলার্জির মতো ছড়িয়ে পড়ে আমার শরীর ও মনে, এ-সবই যেন আগেভাগে জেনে নিয়েছিলো মনীশ। গাড়িতে ওর পাশে যেতে যেতেই অনুভব করলাম মনীশের

উত্তাপ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে আমার মধ্যে—মনীশকে আমি মহীতোষ বা আমার পরিচিত যে-কেউ ব'লে ভাবতে পারছি না। যেন হঠাৎ আবির্ভূত কেউ নয়, ও আমার অনেক দিনের পরিচিত, অন্তরঙ্গ, বন্ধু—অনেকদিন ধরে এইভাবে আমি ওর সঙ্গে বেরিয়ে আসছি।

নিঃসঙ্গতা থেকে হঠাৎ মুক্তির স্বাদ কে কী ভাবে উপলব্ধি করে জানি না। আমি আমার কথাই বলতে পারি।

এগারোটা বাজার পর রেস্তোরাঁর ভিড় পাতলা হয়ে এলো। ভাবলে অবাক লাগে, এতোটা সময় কেটে গেল নির্ভাবনায়। হঠাৎ রাতের কথা মনে পড়ায় আকস্মিক শীত এসে কাঁপিয়ে দিল আমাকে।

মনীশ বললো, 'চলো, এবার ওঠা যাক।' ওর গলায় সামান্য জড়তা।

আমি ওর চোখের দিকে তাকালাম। ফেরার কথাটা হয়তো আমারই বলা উচিত ছিলো প্রথমে। পর মুহূর্তেই মনে হলো, না, এ-কথা যারা বলে আমি তাদের মতো নই।

'সোমা তো নেই।' সময় নিয়ে বললাম, 'তোমার অতো ফেরার তাড়া কেন।

'অভ্যাস!' ঊর্ধ্বমুখে ধোঁয়ার রিং ছাড়লো মনীশ। অল্প হেসে বললো, 'অবশ্য ও-কথা তুমিই বলতে পারো।

কিছুই বুঝতে পারলাম না।

মনীশ হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলো। 'আসছি' বলে এগিয়ে গেল কাউন্টারের দিকে। টেলিফোনের রিসিভারটা কানে তুলতে দেখলাম ওকে।

মনে পড়লো সন্ধ্যায় আমার ফ্ল্যাটে থাকতে থাকতেই ও ফোন করার কথা বলেছিলো। এতো রাতে ও কার সঙ্গে কথা বলবে।

দূর থেকে মনীশের কাত হয়ে দাঁড়ানো শরীর—কাঁধ, পিঠ, মাথা ইত্যাদির দিকে তাকিয়ে থাকলাম, কথাবার্তার কিছুই কানে এলো না। দূরত্ব দূরত্বই, নতুন করে কোনো উৎসাহ বোধ করলাম না আমি।

মৃদু নীলাভ আলো কেমন এক সম্মোহ সৃষ্টি করেছে রেস্তোরাঁর ভিতর। ক্রমশঃ ছায়াতুর হয়ে উঠছে আলোটা। হতে পারে সবই আমার দৃষ্টির ভুল। মনীশ জোর করায় ক' চুমুক জিন তুলেছিলাম ঠোঁটে, ঘোর লাগছিলো অল্প, সে-জন্যেও হতে পারে। আলোটা কাজলের মতো অনেকক্ষণ লেগে থাকলো চোখে। ছোটবেলায় মার কাছে পরীর গল্প শুনতাম। বিভিন্ন সাজে পরীরা আসতো ঘুম ও স্বপ্ন নিয়ে। তাদের নেমে আসার জন্যে আলোর রূপও যেত বদলে। তখন ফ্রক পরতাম, স্বপ্নের পরীরা ঘুরে বেড়াতো বাস্তব জুড়ে; কোনোদিন মনে হয়নি অবিশ্বাস্য। বয়স হবার পরও অনেকদিন টিক্লুকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে আমি সেই রূপান্তরিত আলো প্রত্যক্ষ করার কথা ভেবেছি। আজ আবার সেই স্মৃতি এসে আঘাত করলো আমাকে।

অন্যমনস্কতা কাটতে লক্ষ করলাম সামনের টেবিলের দম্পতি তাকিয়ে আছে আমার দিকে। নতুন বিবাহিত; অন্তত মেয়েটির সিঁথির দিকে তাকালে তাই মনে হবে। আমি বোধহয় একটু বেশিক্ষণই তাকিয়ে ছিলাম। চোখ নামিয়ে মেয়েটি তার পুরুষটিকে কিছু বললো, পুরুষটি ঘুরে তাকালো আমার দিকে—মুখে চতুর হাসি। আমার খারাপ লাগলো। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

ফিরে এসে টেবিলে হাতের ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালো মনীশ। বললাম, 'চলো।'

বেরুবার সময় আমার পিঠে আলতো হাত রাখলো মনীশ।

'এতোক্ষণ নিশ্চয়ই মনে মনে খুব গালাগালি দিচ্ছিলে!'

কেন! ভাবলাম আমি। জবাব দিলাম না।

নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত একজন যুবতীর চোখ মুখের চেহারা কেমন হয়! সবরকম স্বাভাবিকতার মধ্যেও কি তাকে চেনা যায় আলাদা করে! বা, এমন কি হতে পারে যে এই মুহূর্তে সাদা সিঁথিতে সিঁদুর পরে এলাম আমি, সেই ছলনাটুকু কি কেউ ধরতে পারবে! এলোমেলো এইসব চিন্তা অস্পষ্টভাবে ছুঁয়ে গেল আমাকে। গলায় হাই উঠে আসতে হাত চাপা দিলাম ঠোঁটে।

ঠিক জানি না, এর সবটাই হয়তো সংস্কার। সিঁদুর নোয়া সমস্তই। হয়তো অভ্যাস। মহীতোষের সঙ্গে ছেড়ে কাকার বাড়িতে উঠে আসার পরও অনেকদিন পর্যন্ত নিয়ম করে সিঁথিতে সিঁদুর পরেছি আমি, নোয়াটা পরে থাকার দরকার নেই আর, এমন কথাও মনে হয়নি অনেকদিন। এই সেদিনও চলে আসবার আগে বাক্স গোছাতে গোছাতে বিয়ের লজ্জাবস্ত্রটা চোখে পড়লো, সেটাকে ফেলে দেবার কথা ভাবলাম না একবারও! আমি জানি খুঁজলে সিঁদুর কৌটোটাও হয়তো পেয়ে যাবো হাতের মুঠোয়। সবই আছে, দুর্বোধ্য আকর্ষণে আগলে রেখেছি সবই। স্মৃতি? কোনদিন এইসব সংস্পর্শে আমিও এসেছিলাম, এই ভেবে?

ভাবনাগুলো কখন যে কোথায় নিয়ে যায় বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝে সবই কেমন জট পাকিয়ে যায়। মনে হয় সব ভাবনাগুলিরই আছে দুটো করে দিক; তার এক প্রান্ত যদি বা ছুঁতে পারলাম, অন্য প্রান্ত থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে।

বৃষ্টি পড়ছিলো। ফাঁকা হয়ে এসেছে রাস্তা, অনেকদূর পর্যন্ত একটিও মানুষের মুখ চোখে পড়লো না। ক্বচিৎ হেডলাইট জ্বেলে আশপাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে ট্যাক্সি কিংবা মোটর। মনীশের হাত স্টীয়ারিংয়ে—গাড়িতে ওঠবার পর একবারও আমি ওর মুখের দিকে তাকাইনি, একটাও কথা বলিনি। দূরত্ব আবার সেই দূরত্বে পরিণত হলো। আজকের সাক্ষাৎ নিতান্তই আকস্মিক—একটা ঘটে-যাওয়া ব্যাপার। মনীশ কেন এসেছিলো আমি জানি না। আর একটু পরেই

আমি পৌঁছে যাবো একলা ফ্ল্যাটে। ক্লান্ত লাগছে, হয়তো ঘুমিয়েও পড়বো। জানি না। হয়তো ঘুম আসবে না, শুয়ে শুয়ে ভাববো কালকের কথা। হয়তো ঘুমের বড়ি খাবো ; একটায় কাজ না হলে দুটো। তবু তিনটে নয়, চারটে নয়। কেন, ভাবলেই মেরুদণ্ড বেয়ে দ্রুত নেমে আসে শীত। আর কোনোদিন যদি মনীশ না আসে বা দেখা না হয় আমাদের, কারুরই কোনো কৈফিয়ৎ দেবার দরকার থাকবে না। লাভ মাঝখানের এই ঘণ্টাতিনেক সময়। কি করে যে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না! এর বেশি আর কিছু চেয়েছিলাম আমি? না। আমার প্রার্থনা পূরণ করার জন্যে ধন্যবাদ জানানো উচিত মনীশকে।

মনীশের চোখ সামনে। ঠোঁট থেকে ইঞ্চিখানেক দূরে জ্বলছে সিগারেট, সিগারেটের গনগনে আগুন। ধোঁয়ার গন্ধ নাকে এলো। জানলার কাঁচ নামিয়ে হাতটা মেলে ধরলাম বৃষ্টিতে। বৃষ্টি ও অন্ধকার একই সঙ্গে ছুঁয়ে গেল আমাকে।

'ভাগ্যিস তুমি এসেছিলে।' বলার কথাটা এতোক্ষণে খুঁজে পেলাম আমি, 'সময়টা কেটে গেল।'

'ধন্যবাদ।'

খোলা গলায় বললো মনীশ, আমার হাতের ওপর ওর হাতের চাপ অনুভব করলাম। একটু সরে বসলাম আমি।

মনীশ বললো, 'ভেবেছিলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো।'

কথার শ্লেষটুকু ধরতে অসুবিধে হলো না। এতোক্ষণ যে আমি চুপচাপ ছিলাম, মনীশ সেটাকে অবজ্ঞা বলেই ধরে নিয়েছে।

এড়িয়ে যাবার জন্যে বললাম, 'বাড়ি তো চিনে গেছো। সোমা ফিরলে একদিন নিয়ে এসো।'

মনীশ শুনলো কি শুনলো না বোঝা গেল না।

সামনে তাকালে এখন আর অন্ধকার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। রাস্তার আলো যেন হঠাৎই স্বল্প হয়ে উঠলো। হাওয়ার জোরও

বেশি। বৃষ্টির ছাঁট বাড়তে কাঁচটা তুলে দিয়ে এলিয়ে বসলাম আমি। রাস্তাটা অন্ধকারেও চিনতে পার'ছ। কিছুটা বিপজ্জনকভাবে একটা গাড়িকে পাশ কাটিয়ে এলো মনীশ। তারপর আবার চুপচাপ। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাবো।

'ন'ম,' মনীশ হঠাৎ বললো, 'তুমি বোধহয় বেঁচেই গেলে—'

'কেন !'

সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিলো না মনীশ। হেড্‌লাইটটা জ্বেলে আবার নিবিয়ে দিলো। ইচ্ছে করেই যেন স্পীড্‌ কমিয়ে দিলো একটু।

'খানিক আগেই তুমি বল'ছলে না, সোমা নেই আমার ফেরার তাড়া কেন !'

মনে পড়লো, বলেছিলাম। এখন অস্পষ্ট লাগলো। দুটো সময়, দুই মুহূর্তের অনুভবের মধ্যে ব্যবধান অনেক। আমি চুপ করেই থাকলাম।

'আমি এখনো অনেকদিন বাঁচবো।' আচ্ছন্ন গলা মনীশের, স্বগতোক্তির মতো করে বললো, 'আজ ও নেই। কিন্তু কাল ও আসবে, কিংবা দু'দিন পরে। যতোদিন ক্লান্ত লাগবে—'

কথাটা শেষ করলো না মনীশ।

'তোমরা বেশ সুখী।' বলার জন্যে বললাম আমি. 'সোমাকে আমি চিনি, ভালো মেয়ে। তুমি এ-কথা বলছো কেন !'

'কথাটা ভালো মন্দের নয়। সুখের মানে এক একজনের কাছে এক একরকম। আমিও—আমরাও হয়তো সুখী। কিন্তু, কি মানে হয় এর ! একই খাবার রোজ খাবার মতো, একই কথা রোজ বলার মতো—'

থেমে, সিগারেট জ্বালিয়ে নিলো মনীশ। সম্ভবত গোছাতে পারছিলো না নিজেকে।

'বেঁচে থাকা নয়। এ শুধুই সুখের অভিনয়। সোমা আর আমি,

আমি আর সোমা ! দর্শক থাক না থাক এই অভিনয় চালিয়ে যেতে হবে। এর চেয়ে ক্লান্তিকর আর কি হতে পারে !'

আমি চুপ করে থাকলাম। ওর উপলব্ধির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তা ছাড়া, হঠাৎ মনে হলো আমার, মনীশ কি জানে, এই মুহূর্তে বৃষ্টি ও গাড়ির নির্জনতার মধ্যে যে-কথা আমরা বলাবলি করছি, তাও শুধুই অভিনয় নয় ! একটু পরেই তো আলাদা হয়ে যাবো ! আর যদি কখনো দেখা না হয় —একটু আগেই ভেবেছি আমি— কারুরই কোনো দায়িত্ব থাকবে না। অভিনয় হলেও, মনে মনে বললাম, তোমরা সুখেরই অভিনয় করে যাচ্ছো, মনীশ ! আমি কি করছি !

পৌঁছে গেলাম। বাড়ির সামনে আস্তে আস্তে গাড়িটা থামিয়ে আনলো মনীশ। আমি নেমে যাবো। তবু একটা দ্বিধা আটকে রাখলো আমাকে। একটা কথা, যে-কোনো কথা বলার জন্যে অপেক্ষা করলাম। কোনো কথাই মুখে এলো না।

ইতস্তত করছি। মনীশ বললো, 'চলো, তোমাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিই।

ঘুরে এসে আমার দিকের দরজাটা খুলে ধরলো ও। নামতেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির রেণুতে মুখ ভেসে গেল আমার। চোখ তুলে মনীশকে দেখলাম আমি। রাতের বেলায় মানুষের মুখ কেমন বদলে যায় ; কেন ও কীরকম ভাবে না বুঝেই আমি লনের ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম।

খুব দূর দিয়ে হর্ন দিতে দিতে একটা ট্যাক্সি চলে গেল। আবার নৈঃশব্দ্য। নৈঃশব্দ্য আমার বুকে। আবার একা হওয়ার আগে রক্তে, শরীরের প্রতিটি রোমকুপে, আমি তার আবির্ভাব টের পাচ্ছি।

আমার হাত থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুললো মনীশ। আমি ঘরে ঢুকলাম, সুইচ্ টিপে আলো জ্বাললাম। আকস্মিক আলোর প্রভাবেই হয়তো তাড়াতাড়ি অন্ধকারে মুখ ফিরিয়ে নিলো মনীশ।

'বসবে— ?'

জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলো মনীশ। খানিক আগে ও অভিনয়ে ক্লান্তি বোধ করার কথা বলেছিলো।

ঘরের মধ্যে এখন আমরা মুখোমুখি। দূরত্ব সমান। আঁচলের চাপ দিয়ে মুখ ও কপাল থেকে বৃষ্টির রেণুগুলো মুছে ফেললাম আমি। আলোটা বেশি মনে হচ্ছিলো—একটা ট্রেন ছুটে আসার মতো চোখ-ধাঁধানো আলো; শিরশির করে উঠলো সমস্ত অবয়ব। সাঁতার না-জানা লোকের মতো জলের মধ্যে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎই অনুভব করলাম পায়ের নিচে বালির স্পর্শ সরে যাচ্ছে।

মনীশকে নয়, আমি ছাড়া এই ঘরে উপস্থিত অন্য ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললাম, 'বসো। কফি করে আনছি—'

এটার দরকার ছিলো। আমার নারীত্ব আমাকে সচেতন করে তুললো।

'কী' দরকার!' সে বললো, 'তুমি রেস্ট নাও। আমি চলি।'

ভাঙা, কেমন ছেঁড়া-ছেঁড়া কণ্ঠস্বর মনীশের। ভয় হলো, কথা বললে এখন আমিও ওর কণ্ঠস্বর অনুকরণ করবো। কিছু না বলে কান থেকে দুল খুলতে খুলতে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি।

পায়ের নিচে বালির স্পর্শ সরে যাচ্ছে ক্রমশ। এমনই একটা মুহূর্ত যখন আমি ছুঁতে পারছি নিজের রক্ত—ত্বকের সর্বত্র তীব্র জ্বালা, অসাড় হয়ে আসছে হাত পা—যেন আমার প্রতিটি রোমকূপ ফুঁড়ে ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে আসছে রক্ত! প্রাণপণে নিজেকে সংযত করতে করতে এলিয়ে পড়লাম বিছানায়। পূর্ণগ্রাসের মতো, দেখলাম, ক্রমশ মৃদু ও মন্থর হয়ে আসছে ঘরের আলো।

'নমি!'

আচ্ছন্নতার মধ্যে কানে এলো মনীশের গলা। যেন চতুর্দিক থেকে আমাকে পরিবৃত করে ফেলছে মনীশ; আমি চোখ বন্ধ করলাম। তারপর, স্পষ্ট করে কিছু বোঝবার আগেই আমার ঠোঁট ও জিভ আপ্লুত হয়ে এলো। মনে হলো বুকের ভিতর হাত ডুবিয়ে আমার

হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে আনছে মনীশ। বাঁচ্, বাঁচ্, বাঁচ্—একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ আস্তে আস্তে থিতিয়ে এলো শরীরে। আমি বাধা দিলাম না। কী হল বুঝতে পারছিলাম না; কিন্তু একই সময়ে অনুভব করলাম, আমার ভালো লাগছে। শরীর জুড়ে শরীরের তীব্র স্বাদ অনুভব করতে করতে দু'হাতে আগলে ধরলাম মনীশকে। যেন বহুকাল বিদেশে কাটিয়ে আবার আমি ফিরে আসছি আত্ম-পরিচয়ের মধ্যে। এর কিছুই আমি হারাতে চাই না।

তিন

প্রথমে ভেবেছিলাম স্বপ্ন। আলস্যের মধ্যে পাশ ফিরতে যাবো, আবার সেই দীর্ঘ, ধাতব শব্দটা কানে এলো।

হুড়মুড় করে বিছানার ওপর উঠে বসলাম আমি। স্কাইলাইট দিয়ে অল্প আলো ঢুকছে ঘরে, এই আলোয় ঠিক ক'টা বাজে ঠাহর করা যায় না। মনে হচ্ছে বেশ বেলা হয়ে গেছে। মাথার দিকে জানলাটা খুলে দিতেই ঝলমলে রোদে ঘর ভরে গেল। ন'টা বাজতে আর মাত্র মিনিট পাঁচেক বাকি।

দরজায় আবার কলিং বেলের শব্দ হলো। আমার গায়ে শুধু ব্লাউজ আর পেটিকোট, বালিশের কাছে আধখোলা চশমার মতো নাক উঁচিয়ে পড়ে আছে ব্রেসিয়ারটা, নীল শাড়টা লুটোচ্ছে মেঝেয়। কাল রাতে যেটা যেখানে ছিলো ঠিক তেমনিই পড়ে আছে। ব্লাউজের বোতামগুলো ভালো করে এঁটে শাড়িটা কোনোরকমে জড়িয়ে নিলাম গায়ে। কে ডাকছে বুঝতে পারছি না। যেই হোক নিশ্চয় অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ। এবার আমার বেরুনো উচিত।

দরজা খুলে দেখলাম মিস্টার লাহিড়ী দাঁড়িয়ে আছেন। আমার বাড়িঅলা।

'ও, আপনি! আসুন—'

'ঘুমোচ্ছিলেন নাকি?'

তীব্র চোখে আমার দিকে তাকালেন ভদ্রলোক। দৃষ্টিতে বিস্ময় ছাড়াও ছিলো আরো কিছু—বোধহয় আমার ঢিলেঢালা পোশাকই তাকে আকর্ষণ করেছিলো বেশি। আঁচলটা টেনে গলা পর্যন্ত ঢেকে নিলাম আমি। কাল এই ফ্ল্যাটে আসার পর অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেছি আমরা, অনেকক্ষণ ধরে আমাকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন ভদ্রলোক। আজ আর নতুন করে কিছু দেখার নেই। আমি খুব গা করলাম না।

'খুব চিন্তায় ফেলেছিলেন যা হোক!' মিস্টার লাহিড়ী বললেন, 'দেরিতে ওঠাই অভ্যাস নাকি?'

'না, ঠিক তা নয়।' বিব্রত হয়ে বললাম, 'আজই একটু দেরি হলো। কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ, বলবো বলেই তো এলাম। কথা ছিলো কয়েকটা—'

এই এক ঝামেলা, ভদ্রলোকের মুখের চেয়ে চোখই কাজ করছে বেশি! পোশাকটা বদলে না এলেই নয়। তা ছাড়া, হাবেভাবে মনে হচ্ছে সহজে নড়বেন না। বললাম, 'আপনি বসুন। আমি এখুনি আসছি!'

তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে ঘরে এসে কাপড়টা বদলে নিলাম আমি, আর যা যা করার করলাম। বিছানার দিকে তাকাতেই গা শিরশির করে উঠলো। কী অদ্ভুত ছিলো কালকের রাতটা—এখন ভাবলে মনে হয় অবিশ্বাস্য! অবচেতনায় আমরা অনেক কাহিনী সৃষ্টি করে নিই, বাস্তবের সঙ্গে যার কিছুই মেলে না। কালকের ঘটনাও যেন তেমনি কিছু। অনেক স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন আমার মনে থাকে হুবহু, হয়তো এর কোনো একটির সঙ্গে এটাকেও মেনে নিতে হবে।

যাকগে, ভাবনার সময় পরেও পাবো। আপাতত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম আমি।

'প্রথম প্রসঙ্গ ঝি।' মিস্টার লাহিড়ী এইভাবেই শুরু করলেন, 'আমার ঝি'ই আপনার ঘর মোছা বাসন ধোয়ার কাজকম্ম করে দেবে। আমার ওয়াইফ কথা বলেছে, গোটা পঁচিশেক টাকা দিতে হবে।'

'ওয়াইফ' কথাটার ওপর জোর দিলেন ভদ্রলোক, ফ-এর উচ্চারণটা ভ-এর মতো হলো। এসব কথা সাধারণত মেয়েরাই পাকা করে দেয়। কাল বিকেল থেকে এ পর্যন্ত তিনবার এসেছেন ভদ্রলোক, কিন্তু ওঁর স্ত্রীকে একবারও চোখে দেখিনি।

মনোভাব গোপন করে বললাম, 'বেশ তো। পাঠিয়ে দেবেন।'

চোখ মুখ ধুয়ে এলেও ঘুমের জড়তা গেল না।

এতো দ্রুত প্রসঙ্গটা শেষ হয়ে যাবে ভদ্রলোক বোধহয় তা আশা করেননি। ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এখানে আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো ?'

'না, না।' আমি বললাম, 'আপনারা থাকতে অসুবিধে হবে কেন!'

'হলে বলবেন। আমাকে সব সময় নিজের লোক ভাববেন।'

ওঁর চোখ আমার কপাল থেকে গলায়, গলা থেকে বুকের ওপর নেমে এলো।

'আপনার স্ত্রী কি খুব ব্যস্ত থাকেন ?' বিরক্ত হয়ে বললাম—যতোটা মোলায়েম করে বলা যায়, 'তাঁকে এখনো দেখলাম না !'

'হ্যাঁ, ঈষৎ ব্যস্ত তো থাকতেই হয়। সকালে পুজোপাঠ আছে, দু'জন হলেও সংসারে কাজ কি কম ! স্ত্রীজাতিই সংসারের শোভা। অবশ্য আপনার কথা স্বতন্ত্র !' বলতে বলতে খেই হারিয়ে ফেললেন ভদ্রলোক এবং তারপরেই আচমকা বললেন, 'আমি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষে।'

হাসি চাপতে পারলাম না। মায়াও হলো অল্প। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেও কি ভদ্রলোক বুঝবেন না আমাকে খুশি করার কোনো প্রয়োজন নেই তাঁর, তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হবারও কোনো কারণ নেই আমার ! আমি এখানে এসেছি নিজের স্বার্থে, নির্ঝঞ্ঝাটে থাকবো বলে, আমার সুবিধে অসুবিধেগুলো একান্তভাবেই আমার। এসব নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করা মানেই আমাকে বিব্রত করা।

যাই হোক, তাড়াতাড়ি আলাপ শেষ করার জন্য বললাম, 'লোকের কি হলো ? খবর পেয়েছেন ?'

'পেয়েছি বইকি। এটা হলো দ্বিতীয় প্রসঙ্গ। একজন শক্ত-সমর্থ বিধবাকে পাওয়া গেছে, কাল পরশুই আসবে।'

'রান্নাটান্না জানে তো ?'

'কী যে বলেন !.আমি আর আমার ওয়াইফ দু'জনেই চিনি তাকে। আমার পিসতুতো ভাই গণেশ বড়ো সরকারী চাকুরে, ভবানীপুরে থাকে। তা গণেশ বদলি হয়ে যাচ্ছে, একে আর সঙ্গে নেবে না। একবার আসুক, দেখবেন আপনি আমাকে বার বার নিমন্ত্রণ করে খাওয়াচ্ছেন।'

'বেশ। কাল থেকে এলেই ভালো। আজকের দিনটা চালিয়ে নেবো।'

আমি উঠলাম। যে-রকম জুত হয়ে বসেছেন মিস্টার লাহিড়ী, সহজে নড়বেন বলে মনে হয় না।

'স্ত্রীলোকের দেখাশোনায় স্ত্রীলোকই ভালো।' উঠতে উঠতে বললেন মিস্টার লাহিড়ী, প্রয়োজনে গা হাত পা-ও টিপে দিতে পারবে।'

কথার ধরনে হেসে ফেললাম। দরজার বাইরে গিয়ে মিস্টার লাহিড়ী একটু দাঁড়ালেন। আরো কিছু বলার ইচ্ছে ফুটে উঠলো তাঁর মুখে।

এইবার আমি দারজাটা বন্ধ করে দেবো। ঘুম থেকে উঠে পর্যন্ত চা খাওয়া হয়নি, ম্যাজমেজে ভাবটা কাটছে না কিছুতেই। ভদ্র লোক গেলে সে-ব্যবস্থা করতে পারি। কিন্তু মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করতে সাহস হলো না। বরং মনে হলো লোকটির প্রতি আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। যতই বিরক্তিকর হোক তাঁর ব্যবহার, মনটা খারাপ নয় ; না হলে একটি ডিভোর্সড্ যুবতীকে ভাড়াটে হিসেবে কেউই যে রাখতে রাজী নয়, বাড়ি খুঁজতে বেরিয়ে আমি আর পরিতোষ দু'জনেই সেটা বুঝেছিলাম। আইন আমাকে এক ধরনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলেও দেয়নি স্বাধীনতা—আত্মরক্ষার অধিকার। আগে ভাবিনি সমাজের চোখে—নাকি পৃথিবীর চোখে—এতোখানি অবাঞ্ছিত হয়ে পড়বো আমি, লোকে সন্দেহ করবে, অন্তত মন খুলে

গ্রহণ করতে পারবে না আমাকে। এমন কি সামান্য একটা ফ্ল্যাট খুঁজতে গিয়েও মুখের ওপর বন্ধ হয়ে যাবে দরজা : ডিভোর্স্‌ড্‌! সরি. এটা ফ্যামিলি কোয়ার্টার্স !

নিজের মনেই নরম হয়ে এলাম আমি। ভদ্রলোক উপকার করতেই এসেছিলেন, হয়তো তাঁকে এক কাপ চা অফার করা উচিত ছিলো। এখন আর ভুল শোধরানোর উপায় নেই।

মিস্টার লাহিড়ী বোধ হয় আমার চোখে ভরসা খুঁজে পেলেন। ইতস্তত করে বললেন, 'কাল তো আপনি অনেক রাত করে ফিরেছেন। খেলেন কোথায় ? হোটেলে ?'

ঠিক এই প্রশ্নটির জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। একটা ধাক্কা খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম আমি। এটা বাড়াবাড়ি এবং অশোভন ; দেরি করা, না করা—সবটাই আমার ইচ্ছে, অন্তত যখন এর জন্যে কারুর কোনো অসুবিধা হয়নি। আমি রূঢ় হতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ খেয়াল হলো এটা নিতান্তই কৌতূহল হতে পারে। আর সত্যিই তো, ভদ্রলোক আমার কাছে কৈফিয়ত চাননি।

বললাম, 'হ্যাঁ বাইরে খেয়েছি।'

'মধ্যে মাঝে সেটা ভালো। রুচির বদল সবসময়েই দরকার।' বলে আমার মুখের দিকে তাকালেন মিস্টার লাহিড়ী।

এখন আমার চোখে কোনো সহানুভূতি নেই। ইচ্ছে করেই চোয়াল শক্ত করলাম আমি। ভদ্রলোকের বোঝা উচিত ইতিমধ্যেই আমার অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে। প্রায় অপরিচিত একজন মহিলাকে ঘুম থেকে তুলে এভাবে আটকে রাখা অনুচিত এবং অভদ্রতা।

কিন্তু মিস্টার লাহিড়ী যেন স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এসেছেন, খুঁটিনাটি যাবতীয় ব্যাপার জেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। এতোটুকু দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে বললেন, 'সঙ্গে একজন ভদ্রলোক ছিলেন। নিশ্চয়ই কোনো আত্মীয় ?'

আমার ধৈর্য থাকলো না। খারাপ শোনাবে ভেবেও বললাম, 'না, আত্মীয় নয়। বন্ধু। কিন্তু আপনাকে তো আমি দেখিনি! অতো রাত্রে আপনি কী করছিলেন? আমাকে দেখলেন কী করে?'

'এই, চোখে পড়ে গেল আর কি! বুঝতেই পারছেন বয়স হলে ঘুম এমনিতেই কমে যায়। তখন পায়চারী করি বারান্দায়।' ছায়া ছড়িয়ে পড়লো মিস্টার লাহিড়ীর মুখে, চোখের ওপর ঘন ভুরু দুটো জুড়ে এলো। 'আচ্ছা নমস্কার। আর আপনার সময় নষ্ট করবো না। যা বলতে এসেছিলাম—ঝি আসবে—'

সিঁড়িতে ওঁর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

মাঝে মাঝেই হিসেবে ভুল হয়ে যায় আমার। মন তৈরি না থাকলেও প্রবৃত্তি এসে ঝাঁকুনি দেয়, আর তখনই একটা না একটা গোলমাল করে ফেলি। এটা আমার স্বভাব, সম্ভবত রক্তেই মিশে আছে। প্রায়ই ভাবি স্বভাবটা শুধরে নেবো, একটু বিনীত হয়ে থাকলে ক্ষতি কি! কিন্তু, দুর্বোধ্য জেদ কিছুতেই ছাড়ে না আমাকে।

এ নিয়ে তিরস্কারও কম শুনিনি। কাকা বলেছিলেন, এতো জেদ ভালো নয়। ভুলে যাস কেন তুই মেয়ে! মহীতোষ আমার হাত মুচড়ে ধরে বলেছিলো, তোমার জেদ কি করে ভাঙতে হয় আমি জানি! বেশ্যা মাগী, তোকে আমি মুর্গী জবাই করবো। পরিতোষ, এখনো যাকে আমার সবচেয়ে কাছের জন বলে মনে হয়, বলেছিলো, বৌদি, জেদ থাকা ভালো, যদি শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে পারো। তুমি কি পারবে! বরং আমার কথাটা শোনো, দাদা অন্যায় করছে বলে তুমি সেটা মেনে নেবে কেন! ও আলাদা থাকুক, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। কী দরকার ডিভোর্সের! আমরা তো তোমাকে ফেলে দিইনি!

এদের একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক নেই কোনো। এরা সবাই আমার মধ্যে জেদ দেখেছিলো।

মিস্টার লাহিড়ীকে শেষের কথাগুলো বলা ঠিক হলো কি না জানি না। হতে পারে, তাঁকে যতোটা উদার ও গোবেচারা ভাবছি

তিনি তা নন, হয়তো তাঁর সমস্ত কৌতূহলের ভিতরেই লুকিয়ে আছে ক্রূর সাপের জিভ। কোনো প্রশ্ন না করেই এই ফ্ল্যাটটা তিনি আমাকে দিয়েছেন। তবু, আমি কি ঠিক জানি, আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে ওঁর কোনো প্রশ্ন ছিলো না, সন্দেহ ছিলো না! আমি কি ঠিক জানি, আত্মীয়কে ক্ষমা করা যায়, কিন্তু বন্ধুকে যায় না!

ভাবনাগুলো এই সকালেই বিষণ্ণ করে দিলো আমাকে। সম্ভবত মিস্টার লাহিড়ীকে আর একটু সহ্য করতে পারতাম আমি, আরো একটু সমীহ—সেটাই করা উচিত ছিলো। শেষ পর্যন্ত এই ফ্ল্যাটটাও যদি ছাড়তে হয় আমাকে, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো! কাকার কাছে? না। পরিতোষদের কাছে? না। ফেরার এইসব পথ আমি নিজেই বন্ধ করে দিয়েছি। হঠাৎই মনে হলো, কোথাও না কোথাও একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছিলো আমার, নিজের ভুলেই সেটা ছেড়ে এসেছি। অতীত ছুটে বেড়াচ্ছে পিছনে—একলা বুনো পাখির মতো কোনো গাছই এখন ডানা মুড়বার পক্ষে নিরাপদ নয়।

কিচিনে গিয়ে চায়ের জল ফুটতে দিলাম। পেয়ালা, পিরিচ ধুয়ে রাখলাম যথাস্থানে। এই ধরনের ছোটোখাটো কাজে কখনো আমার অবসাদ লাগে না। আমি অভ্যস্ত। শ্বশুরবাড়িতে আমার কাজের মধ্যে একটিই কাজ ছিলো, জনে জনের মুখে চা, কফি জোগানো। তারপর মহীতোষ এবং আমি, নিজেও, কিছু কম চা-খোর নই; নিজের অভ্যাসটা যদিও. ইদানীং কিছুটা কমে এসেছে। আজ অবসাদ লাগলো। শুধু নিজের জন্যে করতে হচ্ছে বলে নয়—ও সব ভাবালুতাকে আমি মোটেই প্রশ্রয় দিই না। ভয় লাগলো, এর পরেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমার কিছু করার নেই ভেবে। বাঁধাধরা রুটিন মাফিক জীবনযাপন এক সময় খুব একঘেঁয়ে লাগতো, যাকে বৈচিত্র্য বলে বা নতুনত্ব, হাঁসফাঁস করতাম তার অভাবে। এখন মনে হচ্ছে বৈচিত্র্য বড়ো দূরের বিষয়। রুটিন আছে বলেই হাঁসফাঁস করতে করতেও বেঁচে যায় মানুষ—সকালের পর দুপুর আসে, বিকেলের পর সন্ধ্যে,

অত্যন্ত দ্রুত। সময়ই চালিয়ে নিয়ে যায়। পরিচ্ছন্ন ঘুম হয় রাতে। দিন কেটে যায় স্বচ্ছন্দে।

এই জীবনের স্বাদ আমি পেয়েছি। এখন, সব ছেড়েছুড়ে এসে আমি প্রার্থনা করছি সেই গতানুগতিকতা, এক সময় যা মনে হতো অসহ্য।

চা খেয়ে কিছুটা চাঙ্গা লাগলো। মিস্টার লাহিড়ীর কথা ঠিক হলে আর একটু পরেই ঝি আসবে। ঘরদোর পরিষ্কার করার দায়িত্ব তার। ভাবছি আজও বাইরে খাবো। রাত্রে বেরুবো না, সুতরাং রাতের খাওয়া বাড়িতে সারতে হবে। দুপুরে একটা ছবি-টবি দেখলে কেমন হয়! যে-কোনো ছবি; একবার টিকিট কেটে হলের ভিতর ঢুকতে পারলে ঘণ্টা তিনেকের জন্যে নিশ্চিন্ত। শুধু তাই নয়, আমার বেরুনো দরকার। ভাবতে গিয়ে নিঃশ্বাস গুলিয়ে উঠলো বুকের মধ্যে। হঠাৎ মনে হলো, সম্পর্ক ও কর্মব্যস্ততা নিয়ে চারিদিক ডুবে যাচ্ছে জলে, আমিই শুধু ভেসে আছি দ্বীপের মতো!

কিন্তু এভাবে চলবে না। আমাকে আমার রাস্তা খুঁজে বের করতেই হবে—যে করেই হোক, আমি ভাবলাম, যে-কোনো উপায়ে।

এ ঘর থেকে ও ঘরে গিয়ে জানলাগুলো খুলে দিলাম আমি। রোদ্দুরে ঝকঝক করছে চারিদিক। যতোটা দেখতে পাচ্ছি, আকাশও খুব পরিষ্কার। বেরুতে হলে এখনই বেরিয়ে পড়া ভালো। মিস্টার সরকার কিছুদিন আগে একটা চাকরির কথা বলেছিলেন—একটা মার্কেন্টাইল ফার্মে রিসেপ্‌সনিস্টের কাজ; ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিলো। আজই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি। সেই কাজটা না হলেও অন্য কোনো কাজ হতে পারে। তুমি শিক্ষিতা, তোমার চাকরি পেতে অসুবিধে হবে না;—শেষ যেদিন গিয়েছিলাম, আমাকে এইভাবে আশ্বস্ত করেছিলেন মিস্টার সরকার। ইউ হ্যাভ দ্য এড্যুকেসন অ্যাণ্ড দ্য চার্ম, হোয়াই মাস্ট ইউ ওয়্যারি! নমিতা, মেয়েরা আজকাল অনেক এগিয়ে গেছে, একটা আধটা মিস্‌হ্যাপ তাদের ক্ষেত্রে

কিছু নয়। আই গুড্ সে, এখন তুমি অনেক বেশি স্বাধীন। সংসারের টান থাকলে কাজকর্ম চাকরি-বাকরিতে মন বসে না। তু'ম কিছু ভেবো না, একটা না একটা কিছু হয়েই যাবে।

মিস্টার সরকারকে আমার খুব ভালো লাগে। কাকার বন্ধু; ব্যবসার কাজে একসময় মহীতোষ ওঁর কাছে প্রচুর সাহায্য পেয়েছিলো। এক সময় প্রায়ই তিনি আমাদের বাড়ি আসতেন। তারপর যা হয়, অন্যান্য অনেকের সঙ্গে তাঁকে ও আমাকে জড়িয়ে মহীতোষ অনেক কিছু ভেবে নেয়—সন্দেহ মহীতোষকে অন্ধ করে দিয়েছিলো। সে যাই হোক, মিস্টার সরকার সেই ধরনের মানুষ, যাঁরা যে-কোনো অবস্থা থেকেই জীবনকে দেখতে পারেন সমান চোখে, পারেন আশায় ভরে তুলতে। সম্ভবত তাঁর মতো আরো কেউ কেউ আছেন—আমার চেনাশোনার মধ্যে পরিতোষকেই দেখেছি—নিজের বাইরেও যাঁরা অন্যকে ভালোবাসতে ভালোবাসেন। মিস্টার সরকার যদি সত্যি সত্যিই একটা কাজ জুটিয়ে দেন—যে কোনো কাজ, তাহলে বেঁচে যাবো। আজই আমার যাওয়া উচিত।

বেলা বাড়ছিলে। ঝি আসতে তাকে কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে বাথরুমে ঢুকলাম। উদ্দেশ্য, স্নানটান সেরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া। ফেরার পথে খেয়ে নেবো কোথাও। খুচরো কিছু কেনাকাটা আছে, সেগুলোও সারতে হবে। পরিতোষ বলেছিলো এর মধ্যে একদিন টিক্লুকে নিয়ে আসবে। কবে আসবে সেটা জানা দরকার। ওর অফিসে ফোন করে জেনে নেবো। এবং আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবো।

চিন্তাগুলো আসছিলো পর পর; এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালো। আমি জামা কাপড় খুলতে শুরু করেছিলাম। নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই গত রাতের ঘটনা মনে পড়ে গেল। আকস্মিকভাবে জ্বর আসার মতো কেঁপে উঠলো শরীর। আশ্চর্য! এতোক্ষণ কী করে ব্যাপারটা ভুলে ছিলাম আমি! আমি কি

অনুভূতিহীন হয়ে পড়ছি? নাকি সমস্তই ছিলো ঠিকঠাক, অবচেতনায়, শুধু কিছুক্ষণের জন্যে তাকে আমি আড়াল করে দাঁড়িয়েছিলাম!

মনে পড়লো, সকালে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাটা মনে পড়েছিলো আমার—রাতের সমস্ত চিহ্ন ছড়িয়ে ছিলো আমার বিছানায় ও আশেপাশে, তবু বিশ্বাস হয়নি। এখন বুকের ওপর সুস্পষ্ট দাঁতের দাগ লক্ষ করেও বিশ্বাস হলো না। শুধু আপ্লুত হতে লাগলো সমস্ত শরীর—যেন আবার আশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছি আর একটি শরীরে, সবেগে ছুটতে শুরু করলো রক্ত। দুঃসহ অসহায়তার মধ্যে আমি চাইলাম সেই বিস্ফোরক অনুভূতিকে ফিরিয়ে আনতে। নিজেকে ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছিলো আমার, এতোক্ষণের যবতীয় ভাবনা তালগোল পাকিয়ে গেল মাথার মধ্য—সেই স্পর্শ ও উত্তেজনার জন্যে চিৎকার করে উঠলো সমস্ত শরীর। ব্যাপারটা গর্হিত, একই সময়ে ভাবলাম আমি এবং কোনোরকমে সংযত করলাম নিজেকে।

কেন এমন হয় জানি না। অনেক ভেবেও কালকের ঘটনার কোনো যুক্তি খুঁজে পেলাম না। শুধু ধিকার দিলাম নিজেকে, ঘৃণায় কুঁকড়ে এলো শরীর। এর আগে কখনো নিজেকে এমনভাবে ঘৃণা করিনি।

অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলাম আমি। বাথরুম থেকে বেরুতে দেরি হলো। শ্যামা, ঝি, শোবার ঘর মুছছিলো। বিছানাটা এরই মধ্যে পরিপাটি করে সাজিয়ে ফেলেছে ও, বেডকভার বিছিয়েছে নিখুঁত করে, ঘরের কোথাও এতোটুকু অপরিচ্ছন্নতার চিহ্ন নেই। আমার চোখ খুশি হয়ে ঘুরতে থাকলো ঘরের চারিদিকে। নীল শাড়িটা পাট করে তুলে রেখেছে আলনায়—ওটা ধোপার বাড়ি পাঠাতে হবে। শাড়িটার ওপর থেকে চোখ ফেরাতেই আলনার হ্যাঙ্গারে দৃষ্টি আটকে গেল। একটা টাই ঝুলছে। মনীশের জিনিস, দেখেই চিনতে পারলাম—তীব্র ও সুখকর অবসাদের মধ্যে আমাকে রেখে হঠাৎই ওর ফেরার কথা মনে হয়েছিলো, হয়তো ভুলে ফেলে গেছে। নতুন অস্বস্তি ঘিরে ধরলো আমাকে।

শ্যামা চলে যেতে টাইটা নিজের ব্যাগের মধ্যে রেখে দিলাম। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ শুরু হলো আবার---এটা মনীশকে ফেরত দেবো ? রেখে দেবো নিজের কাছে ? ভাবনাটা ক্রমশ অধিকার করে নিলো আমাকে। শ্যামা টোস্ট তৈরি করে রেখেছিলো ; কোনোরকমে মুখে দিয়ে, পোশাক বদলে, খুব শান্তভাবে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়।

ঝলমলে রোদ্দুরে কচি লেবু পাতার মতো একটা অস্ফুট আভা ছড়ানো। উত্তাপ নেই বললেই হয়। মাঝে মাঝে গা ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে আচমকা হাওয়া। এ সবই ভালো লাগছিলো আমার ; ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একরকম নির্ভরতা পাচ্ছিলাম মনে। নতুন করে গোটা বিষয়টিকে ভাবতে গিয়ে আমার মনে হলো, না, কোনো অন্যায় করিনি আমি, যা করেছি, করেছি নিজেরই জন্যে। আমি লজ্জা বোধ করতে পারি, কিন্তু এটাকে গর্হিত বলে ভাববো কেন! হয়তো এর জন্যে দায়ী সেই মুহূর্তের সবকিছু, আমার রক্ত, চেতনায় শরীর ছাড়া তখন আর কিছু ছিলো না ; অনেক দিনের বন্ধ দরজা জানলাগুলো খুলে দিয়েছিলাম অসঙ্কোচে। এটাই কি আমার স্বাধীনতা নয়! আমি কেন ভুলতে পারছি না মহীতোষের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে, আমার শরীর ও মনের ওপর তার আর কোনো অধিকার নেই!

হর্ন দিতে দিতে একটা ট্যাক্সি চলে যাচ্ছিলো পাশ দিয়ে। ড্রাইভার আমার দিকে তাকাতে ইশারায় দাঁড়াতে বললাম আমি। গাড়িতে উঠতে উঠতে মনে হলো মনীশ হয়তো আজও আসবে। হয়তো আজও—

কথাটা ভেবে গরম হয়ে উঠলো কান দুটো। নিজেকে নিরস্ত করলাম আমি. না, আর প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। বরং ওকে ফোন করে জানিয়ে দেবো আজ আমি বাড়িতে থাকবো না।

চার

ডায়েরী লেখার অভ্যাস আমার নেই। কোনোদিন ভাবিইনি ওসব। মাঝে মাঝে মনে হয় ওইরমক একটা কিছু থাকলে মন্দ হতো না। লুকিয়ে গয়নার বাক্স নিয়ে নাড়াচাড়া করার মতো অবসর মুহূর্তে পাতা উল্টে দেখা যেতো কতোটা জমলো, কতোটা বাদ গেল ; কী পেলাম কী পেতে পারতাম অথচ পেলাম না !

স্মৃতি খুঁড়লে শুধু পাথর আর শাবলে ঠোকাঠুকি লাগে, শব্দ ওঠে ধাতব। দিনের বেলায় যেমন তেমন করে কেটে গেলেও মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে ওই শব্দ প্রায়ই হানা দেয়। আমার কাছে তাদের অনেক দাবি, ঠেলেঠুলে যে যতোটা পারে দখল করে নিতে চায় জায়গা— স্মৃতির ভার সহ্য করতে হয়ে পড়ি মুহ্যমান। তখন অনন্যোপায় আমি ভগবানের কথা ভাবি। হয়তো আছেন তিনি, হয়তো নেই। আমি কোনোদিন তাঁর সান্নিধ্য পাইনি।

সান্নিধ্য ? না সাহায্য ? নাকি অবলম্বন ? আমি সবগুলোই চাই— এই মুহূর্তে সবগুলোই আমার কাছে সমান দরকারি।

শুধু আজ ব'লে নয় ; যখন দরকার ছিলো না তেমন, তখনো চাইতাম। অভূমিষ্ঠ শিশু পেটের ভিতর নড়াচড়া করলে তাকে নিয়ে নির্ভরতার ভাবনা যেমন আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে মনে, সুখাবেশে আচ্ছন্ন হয়ে আসে চেতনা, তেমনি ভগবান সম্পর্কে ধারণাটিকেও অনেকদিন পুষে রেখেছিলাম মনে। ফুল ফুটবে কি না-ফুটবে না জেনেও যত্নে জল ঢালতাম অচেনা গাছের গোড়ায়।

আমার শাশুড়ী ছিলেন ধর্মপ্রাণ। বাঁধা গুরুদেব ছিলো তাঁর। সকাল সন্ধ্যায় গুরুদেবের ছবির সামনে বসে যখন ধ্যান করতেন, এক-রকম কোমল আভা ছড়িয়ে পড়তো তাঁর মুখে। প্রথম দিকে এইসব আমি দেখতাম দূর থেকে, আড়াল করে, অসম্ভব কৌতূহল নিয়ে—

যে-চোখে মানুষ চিড়িয়াখানার জন্তু-জানোয়ার দেখে, ছবি-দেখা অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নেয় চাক্ষুষকে।

কী করে জানি না শাশুড়ী আমার এই কৌতূহল টের পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিলো আমি হয়তো দীক্ষা-টিক্ষা নেবার কথা ভাবছি। মানুষের সব চেয়ে বড়ো ভরসা ভগবান, প্রায়ই বলতেন আমাকে, তিনি যাকে দেখেন তাকেই রাখেন। কথাগুলোর ভিতর একটা ছন্দ ছিলো—দূর দুপুরে শোনা বেহালার মতো, রহস্যময় হলেও মন্দ লাগতো না শুনতে। কিন্তু, সত্যি বলতে, যাকে খতিয়ে দেখা বলে সে-রকমভাবে কোনোদিন ব্যাপারটা ভাবিনি।

মহীতোষকে এক আধবার বলেছি। এসব নিয়ে সে কোনোদিনই মাথা ঘামাতো না। ধূর্ত লোকেরা চট করে গুরু হয়ে যেতে পারে, বলেছিলো, ধ্যান করলে টাকা পয়সা পাওয়া যায় কিছু? সেগুলো পাওয়া গেলে বুঝতাম! সুখ, শান্তি, স্বস্তি—টাকা থাকলে এগুলো কেনা যায়। ইমিডিয়েটলি আমার হাজার কুড়ি টাকা দরকার, তোমার শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করো তো টাকাটা ভগবান পাইয়ে দিতে পারে কি না! গুরুদেবের হাতের দু' একটা আংটি খসালেই তো টাকাটা এসে যায়!

সবই অবশ্য কথার কথা। তখন জীবনযাপন ছিলো সহজ। মহীতোষ সবে সাফল্যের রাস্তা খুঁজতে শুরু করেছে, চাবিকাঠি খুঁজে পাওয়া অনেক দূরের ব্যাপার।

মধুপুর না দেওঘর কোথায় যেন থাকতেন মার গুরুদেব। গোলগাল নাদুসনুদুস চেহারার মানুষটি, চকচকে কপাল, বড়ো বড়ো চোখ। চোখ দিয়ে না হোক, দু' হাতের দশটি আঙুলের ছ'টি হীরের আংটি থেকে ঠিক্‌রে বেরুতো দিব্য আভা। বছরে দু'বার স্ব-ভূমি ছেড়ে ভক্তদের ডাকে সাড়া দিতে বেরুতেন গুরুদেব। একবার কলকাতায় এসে মিনিট কয়েকের জন্যে পায়ের ধুলো দিতে এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। গোল গোল চোখের দৃষ্টি ক' মুহূর্ত আমার ওপর নিবদ্ধ

রেখে বললেন, সর্বরূপে সুলক্ষণা। ঈশ্বরে ভরসা রেখো মা, সতীসাধ্বী হবে।

জ্ঞান হবার পর থেকেই শুনে আসছি কথাটা। পুরুষদের সম্পর্কে তেমন স্পষ্ট কোনো বিশেষণ নেই যা চটপট প্রযোজ্য হতে পারে—স্তন ও যোনি থাকার মতো এই সতীসাধ্বী থাকাটাও শারীরিক বৈশিষ্ট্যের মতো আমাকে করে দিয়েছে আলাদা। কথাটার মানে কী! বুঝি না বুঝি, এটুকু অন্তত বুঝি, সতীসাধ্বী আমি থাকিনি। হয়েছি ব্যভিচারিণী। যে-কোনো কারণেই হোক, আইন আমার হাত ধরে এই পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে।

ডায়েরী রাখলে কী লিখতাম! গত পাঁচ ছ'টা বছরে যা ঘটে গেল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, নাকি প্রতি মুহূর্তের টুকরো টুকরো ভাবনা ও স্মৃতি দিয়ে ভরিয়ে তুলতাম খাতা!

ভাবনার পুঁজি দু'দিকেই ভারী; কোনটা বাদ দেবো কোনটা রাখবো ঠিক করতে আজকাল রীতিমতো হাঁফিয়ে উঠি। একা বলেই সম্ভবত স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার দাবি এতো বেশি। যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে, সময় কাটানো মনে হয় কঠিনতম ব্যাপার, তখন যেমন তেমন করে পালিয়ে যাবার কথা ভাবি। কোথায়? শেষ পর্যন্ত এই একটি প্রশ্নই আবার ছুঁড়ে দেয় আমাকে তীব্র, অমানুষিক নিঃসঙ্গতার মধ্যে।

এই কটা বছরে মেয়েরা যা যা হতে পারে তার সবই তো হয়েছিলাম ঠিক। প্রেম, বিয়ে, বছর ঘুরতে না ঘুরতে টিকলু এলো পেটে, নিপুণ হাতে সাজানো সংসারের কর্ত্রী, আর স্বাচ্ছন্দ্য। হিসেব মতো সবই। ডিভোর্স না হলে গতানুগতিক রাস্তায় হয়তো একদিন বৈধব্য পর্যন্ত এগোতাম।

বসে আছি ছুটন্ত ট্যাক্সির আরামে। সময়টা সকালও নয়, দুপুরও নয়, মাঝামাঝি একটা সময়। আষাঢ় মাসের এই সময়টা রোদ্দুর খুব কোমল হয়ে থাকে, আলস্য ও গতির আকর্ষণ সহজেই টেনে নেয়। আমার অবস্থা তো আরো ভালো। যাচ্ছি কাজের সন্ধানে, মিস্টার

সরকারের সঙ্গে দেখা করবো। কিন্তু এটা ঠিক এই মুহূর্তের কাজ নয়, আজকেরও নয়। গতকাল কিংবা আগামী কাল যে-কোনো দিনই দেখা করা চলতো তাঁর সঙ্গে। দেখা করলেই যে কাজ হবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। ভাবনাগুলো তাই আসছিলো পেলব হয়ে, খুব সাবলীলভাবে। এই পর্যন্ত এসে হঠাৎ থামতে হলো। আচ্ছন্নতার মধ্যেই অল্প নড়ে উঠলাম আমি।

বৈধব্য! না, না। আমাকে ক্ষমা করো মহীতোষ; অন্যমনস্কতা থেকে যা চিন্তা করেছিলাম, এই মুহূর্তে আমি তাকে বাদ দিচ্ছি। আমার প্রতি দারুণ সন্দেহ ছিলো তোমার—আমার শরীরের প্রতি, যে-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনে আমাকে ঘর থেকে টেনে এনেছিলে বাইরে, তোমার বন্ধু-বান্ধব ও সমাজিকতার মধ্যে, কে ভেবেছিলো তার জের শেষ পর্যন্ত আমাকেই টানতে হবে! আমাকে সামাজিক করতে গিয়ে তুমি নিজেই হয়ে পড়লে অসামাজিক; ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়লো সেই বস্তুটি, যার জিভ আছে, চোখ নেই; ঘ্রাণের শক্তি আছে, নেই অনুভূতি! সারাক্ষণ তোমার চোখের সামনে থেকেও আমি গেলাম হারিয়ে। পড়ে থাকলো শুধু শরীরটা, তোমার অস্ত্রোপচারের হেতু হয়ে। ব্যভিচারের চিহ্ন ছাড়া সেখানে আর কিছুই নেই। সন্দেহ কি জিনিস—বিশেষত পুরুষের সন্দেহ—তখনই আমি জেনে গেছি। প্রয়োজনের সঙ্গে সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবেই।

শেষ বছরটার কথা মনে আছে? কোন ভাষায় কথা বলতাম আমরা, ব্যবহার করতাম কী রকম! যেন দু'টি বিবাদমান গোত্রের জন্তু দৈবদোষে বন্দী হয়েছে একই খাঁচায়, পরস্পরকে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই তারা করতে পারে না। আশ্চর্য, তখনো আমরা স্বামী-স্ত্রী! তখনো কি ভেবেছিলাম, একদিন সত্যি সত্যিই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো আমরা; যে-খাঁচাটা মনে হতো দুর্ভেদ্য—একদিন নিজে থেকেই খুলে যাবে তার দরজা!

আইন বললো, তোমরা আলাদা হও। আমরা আলাদা হয়ে গেলাম।

অথচ, এই সহজ সমাধানটির জন্যও দুটো বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিলো আমাদের। অপেক্ষা? না সংশয়? বুঝতে পারি না এখনো। সম্পর্ক নেই, আকর্ষণ নেই, শুধু ঘৃণা। তোমার চোখের দিকে তাকালে এক এক সময় মনে হতো হত্যার জন্য তৈরি হয়ে এসেছো! নিজের চোখে দেখিনি; কিন্তু অনুমান করা কী আর এমন শক্ত যে আমার চোখেও ফুটে উঠতো প্রচণ্ড বিদ্বেষ, আমার শেষ অস্ত্র। তবু কেন স্বামী-স্ত্রীর সামাজিক সম্পর্কটুকু আগলে রেখেছিলাম আমরা! মধুর দাম্পত্য জীবনের প্রতি লোভ? তার আগের কয়েক বছরের স্মৃতি? টিক্‌লুর ভাবনা?

এর যে-কোনোটাই সম্ভব হতে পারে। হয়তো সব কারণগুলোই আমাদের পাহারা দিচ্ছিলো গোপনে

আমার কথা বলতে পারি। এতো ক্লেদ, এতো বিদ্বেষ, এতো সন্দেহ সত্ত্বেও একটা বিশ্বাসকে প্রাণপণে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম তখনো। যে-ভুল সন্দেহে তুমি জ্বলছো, ভাবতাম, একদিন না একদিন সেটা চলে যাবে—অক্লেশে আবার আমরা ফিরে যাবো পুরনো দিনগুলিতে। আমার চোখে কি শুধু ঘৃণাই ফুটতো, মহীতোষ! কোন প্রার্থনা কোন অনুনয়ই কি তুমি লক্ষ করোনি!

জানি না। নিজের ভাবনা নিয়েই তখন ব্যস্ত আমি, ক্রমশ গুটিয়ে আসছি নিজের মধ্যে। লক্ষ করিনি, অনুভবের আড়ালে কবে তুমি অন্ধ হয়ে গেছো!

তুমি বাঁচো, মহীতোষ, আরো অনেকদিন ধরে বেঁচে থাকো। পরমায়ু হাত রাখুন তোমার মাথায়। থাকো তোমার মতো করে। টিক্‌লুকে দেখো। সম্পর্ক থাকলো না; পচন-ধরা জায়গাটুকু কাটছাঁট করে আবার পৃথিবী চলেছে নিজের নিয়মে। তিক্ততা আমি ভুলে গেছি, ক্রমশ ভুলে যাচ্ছি সেই জীবন, একদিন যে মিশে ছিলো আমার রক্তে। আমি একা, বড্ড বেশী একা। স্মৃতি বলতে তুমি আর টিক্‌লু আর বিগত দিনগুলি—তারা প্রায়ই ভিড় করে আসছে

মনে; আমি চাইছি, ক্রমাগত চাইছি, তাদের পাশ কাটিয়ে যেতে!

অসম্ভব চেষ্টা। প্রতি মুহূর্তেই বুঝতে পারি অতীতটাকে বিস্মৃত হওয়া মানে নিজেকেই বিস্মৃত হওয়া। তা পারে পাগলে। কিন্তু আমি, রক্তে মাংসে মনে এখনো সজীব—আমি কী করবো! আমি চাই বাঁচতে, যা হারিয়েছি তার স্বাদ ও গন্ধ ও উত্তেজনা সম্পূর্ণ করে ফিরে পেতে। তুমি কি বিশ্বাস করবে মহীতোষ, যে মিথ্যে সন্দেহের ওপর নির্ভর করে তুমি ফিরিয়ে দিলে আমাকে, সুস্পষ্ট জ্ঞানের ভিতর ধীরে ধীরে সেই সন্দেহের যোগ্য হয়ে উঠেছি আমি! এখন ভাবলে বিশ্বাস হয় না—ট্যাক্সিতে যেতে যেতে আমি ভাবছি সেই কথা, অবসাদের ভিতরেও মাঝে মাঝে আন্দোলিত হয়ে যাচ্ছে শরীর। বুঝতে পারছি না, তোমার সন্দেহই হয়তো শেষ পর্যন্ত জোর এনে দিয়েছিলো আমার মনে। না হলে কী করে এটা সম্ভব হলো যে আমার একলা ফ্ল্যাটে, বিছানায়, কাল রাতে একসঙ্গে অনেকক্ষণ কাটালাম আমরা—আমি আর মনীশ; বার বার তোমার মুখ মনে পড়া সত্ত্বেও হারিয়ে যাওয়া একটি অভিজ্ঞতাকে অন্তত আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলাম আমি। মনীশ, তোমার বন্ধু; দৈবাৎ দেখা হয়েছিলো তার সঙ্গে, কী তার উদ্দেশ্য ছিলো জানি না; হয় তো আমার একাকীত্বে সঙ্গ দিতে চেয়েছিলো কিছুক্ষণ। উদ্দেশ্যের কথাটা এখনই আমি ভাবছি, যা হবার হয়ে যাবার পর। এখনো তার প্রবল শরীরের উত্তাপ লেগে আছে আমার শরীরে, আমার রক্তে বয়ে যাচ্ছে মনীশের রক্ত, হাওয়ায় মুখের ওপর এসে পড়ছে তার নিঃশ্বাস। কথাটা শুনলে তুমি ক্রুদ্ধ হতে না মহীতোষ, ঘৃণায় কুঁচকে উঠতো তোমার মুখ। যাকে চিনি না, সামান্য পরিচয়ের পর যার সঙ্গে আমার ক'টা কথাবার্তা হয়েছে গুনে বলে দেওয়া যেতে পারে, সে-রকম একজনের সঙ্গে নিজেকে লিপ্ত করা—সাধারণ অবস্থায় আমিও নিজেকে ঘৃণা ছাড়া এই ব্যাপারে আর কিছু করতে পারতাম না। কিন্তু কী হয়েছিলো আমার কাল!

চেনাশোনার দরকার হলো না কোনো, ভালোবাসা, ঘনিষ্ঠতা ওসব কিছুও নয়; শুধু শরীরে শরীর খেলানো—মনীশ না হয়ে আর যে-কেউ হলেও একই ব্যাপার ঘটতো, আমি জানি।

আইন যা পারেনি আমি তা পারলাম। বোধহয় এতদিনে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম আমরা।

পাঁচ

ট্যাক্সিতে ওঠার পর ড্রাইভার জানতে চেয়েছিলো কদ্দূর যাবো। তখন কিছু না ভেবেই বলেছিলাম, 'সোজা।' আমি জানতাম কোথায় যাচ্ছি। মিস্টার সরকারের সঙ্গে দেখা করবো তাঁর অফিসে। ট্যাক্সিওয়ালাকে বলতে পারতাম, চলো ব্রেবোর্ন রোডে। কিন্তু, কিছু বলার আগেই অন্যমনস্কতা ঘিরে ধরলো আমাকে। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না কদ্দূর যাবো বা কোনদিকে এবং সত্যি সত্যিই শেষ পর্যন্ত মাঝ পথে নেমে পড়বো কি না। আমার পক্ষে এটা কিছুই অসম্ভব নয়, বিশেষত এখন, যখন সময় কাটে নিজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে, উঠতে বসতে সারাক্ষণ নির্ভর করতে হয় নিজের ওপর—যতো না ভাবি তার চেয়ে বেশি ভেঙে ফেলি ভাবনাগুলোকে। আমার সমস্যা আমি নিজে। সমাধান—তাও সৃষ্টি করে নিতে হচ্ছে নিজেকে।

আসলে চাকরির কোন দরকারই নেই আমার। এই মুহূর্তে অন্তত নেই। বেশ জানি, সঞ্চয় যা আছে তাতে হেসে খেলে চলে যাবে; ফেলে ছড়িয়েও অন্তত দু' আড়াই বছর যাবে।

দু' আড়াই বছর অনেকটা সময়। বিশেষত আমার মতো গতিহীন নিশ্চল একজন মানুষের পক্ষে। ঘুরেফিরে প্রতি মূহূর্তে নিজের সঙ্গে দেখা হওয়ার মতো ক্লান্তিকর আর কী হতে পারে! দুরূহ ভারের মতো সময় চেপে বসে বুকের ওপর; প্রতিপক্ষের অভাবে নিজের সঙ্গে নামতে হয় যুদ্ধে। কালই, মনে পড়ে, আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে আত্মঘাতী হবার কথা ভেবেছিলাম আমি। ভয়ে আকস্মিক-ভাবে ঝুলে এসেছিল ঠোঁট দুটো। আমি বাঁচতে চাই, সেই মুহূর্তেই অনুভব করেছিলাম, বাঁচতে চাই ভয়ঙ্করভাবে—মাত্র আঠাশ বছর বয়সে আত্মভুক হবার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।

সোজা বললেও কলকাতার কোনো রাস্তাই সোজা নয়। ট্যাক্সিওয়ালা তবু দ্বিধা করলো না। বা দ্বিরুক্তি! আমার বিশৃঙ্খল

ও অন্যমনস্ক মনোভাব লক্ষ করেই সম্ভবত সে আর কিছু বলার প্রয়োজন অনুভব করেনি। ছোটো আয়নাটা সুবিধে মতো ঘোরানো, তাতে প্রতিফলিত হচ্ছে তার কপাল ও চোখ—হয়তো সে আমার মুখের অনেকটাই দেখতে পাচ্ছিলো। অফিস সময়ের ভিড় কেটে গেছে, সারারাত বৃষ্টির পর চমৎকার রোদ উঠেছে সকালে। শুকনো রাস্তার ওপর দিয়ে আমাকে যথেচ্ছ নিয়ে এসে চৌরঙ্গী রোডে ফেললো ড্রাইভার। সামনে এসপ্ল্যানেড। গতি কমিয়ে পিছন ফিরে তাকালো আমার দিকে, 'কঁহা যানা হ্যায় মেমসাব? নিউ মার্কেট?'

'না।' নিজেতে ফিরে এসে আমি বললাম, 'ব্রেবোর্ন রোড।,

লোকটি আমার মুখের দিকে তাকালো। অল্প কৌতূহল মেশানো চোখ।

বিস্ময় বড়ো একটা চোখে পড়ে না আজকাল। লোকটির সঙ্গে দু' চারটে কথা বলতে ইচ্ছে করলো আমার, যে-কোনো কথা। বয়স্ক পাঞ্জাবি, গালের দাড়িতে পাক ধরে গেছে। এই বয়সের লোকেরা প্রায়ই সহানুভূতিসম্পন্ন হয়। কিন্তু, কী কথা বলার আছে আমার, শুধু এইটুকু ছাড়া যে, যে-ব্যস্ততাহীনতা থেকে তুমি আমাকে নিউ মার্কেটের দিকে নিয়ে যেতে চাইছিলে, এই মুহূর্তে তা থেকে মুক্তি চাইছি আমি! তোমার ধারণার ভুল নেই কোনো, কিছুদিন আগে পর্যন্তও আমি চলতাম তোমার ধারণার সঙ্গে এক হয়ে! মহীতোষ কাজে বেরুনোর পর এক একদিন বেরিয়ে পড়তাম আমিও; কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য থাক, না থাক—নিছক বেড়ানোই হয়তো, এইরকম ভ্রমণে আনন্দ আছে। টিক্‌লু কাছে থাকলে সঙ্গে নিতাম। বেশিরভাগ দিনই সে থাকতো ঠাকুমার কাছে, তখন একা একা। তখনো সময় এমন ভার হয়ে চেপে বসেনি বুকে। সময় কাটানো ছিলো একরকম নেশার মতো; পরিচ্ছন্ন ও সাবলীল জীবন নির্বাহ। এখনো এর সবগুলোই আছে কম বেশি। পিছুটান নেই; সত্যি

বলতে, এখনই তো আমি পুরোপুরি স্বাধীন ! কিন্তু পিছুটান না থাকাটা যে কী ভয়াবহ ব্যাপার এখনই তা অনুভব করছি।

মনে পড়ছে, এইভাবে বেড়াতে বেড়াতে নিউ মার্কেটের সামনে একদিন দেখা হয়েছিলো শেখরের সঙ্গে। আমি হাঁটছিলাম অন্যমনস্ক; হঠাৎ পাশে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো।

'স্বামী বাড়িতে না থাকলে খুব সুবিধে হয় বুঝি ?'

'আরে ! তুমি এদিকে কোথায় ?'

শেখর নেমে এলো গাড়ি থেকে।

'দশটা-পাঁচটায় নিউ মার্কেট মেয়েদের একচেটিয়া শুনেছিলাম। তোমার কথায় সেইটেই পাকা হলো।' শেখর হাসলো। 'ব্যাচেলর মানুষ, কার জন্যে কেনাকাটা করতে আসবো বলো ! অফিসের কাজে বেরিয়েছিলাম। বারোটা বেজে গেছে, ভাবছিলাম লাঞ্চ সেরে ফিরবো। হোয়াট অ্যাবাউট ইউ ?'

'এই তো, ফিরবো এবার—'

'এতো তাড়াতাড়ি !' তীব্র চোখে আমাকে দেখলো শেখর, 'মহীতোষ কি খেতে আসবে বাড়িতে ?'

এ প্রশ্নের মানে বুঝি। ইতস্তত করে বললাম, 'না, তা নয়—'

'তবে আর কি !' আলতো ভাবে পিঠে হাত ছুঁইয়ে আমাকে টেনে নিলো শেখর, 'চলো, একসঙ্গে খাবো। সুন্দরী মহিলার সঙ্গ বড়ো একটা পাওয়া যায় না।'

আমি কাঁপলাম। আমার নিঃশ্বাস মন্থর হয়ে এলো। এসব কথার কী উত্তর হতে পারে আমার ঠিক জানা নেই। কোনোরকমে বললাম, 'আজ থাক। বাড়িতে রান্না হয়ে আছে. নষ্ট হবে—'

কথাটা বলেই বুঝতে পেরেছিলাম দাঁড়াতে পারবো না। শেখর গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়ালো।

'রবিবার দুপুরে হঠাৎ কারুর বাড়ি গিয়ে পড়লে লোকে ওই কথা বলে। এসো, প্লীজ—'

অসম্ভব ওকে এড়ানো। একসঙ্গে খাওয়াটা কিছু নয়—বড়ো জোর একটা উপলক্ষ। আমি জানি শুধু সঙ্গের লোভে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখন ও না খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারে, শুধু কিছুক্ষণের জন্যে আমাকে কাছে পাবে বলে। ওর চোখে আমি সেই অনুনয় লক্ষ করলাম। মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে আলতো হাতে শেখর যখন আমার পিঠ ছুঁয়েছিলো, ওর আঙুলে আমি পেয়েছিলাম অসম্ভব সেই আগুনের স্পর্শ, আমাকে চারিদিক থেকে যা বেঁধে ফেলতে চাইছে। আমি 'না' বলতে পারলাম না।

পুরুষের অনুনয় আমাকে কাতর করে ফেলে। এই সব মুহূর্তে কীরকম একটা ঝড় ওঠে মনের মধ্যে, এলোমেলো হয়ে যায় সব, নারীত্ব ও অহঙ্কার ছত্রাখান হয়ে পড়ে মুহূর্তে। তৃষ্ণার্তকে জল দান না করার চেয়েও এটাকে মনে হয় বড়ো অপরাধ।

নিছক সঙ্গ দান, আর কিছুই নয়। আমি আর শেখর খেলাম এক সঙ্গে, গল্প করলাম কিছুক্ষণ। দুটো বাজবার ঠিক দশ মিনিট আগে উঠে পড়লাম। অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে জরুরী, শেখর ফিরে গেল। আমিও চলে এলাম ট্যাক্সিতে।

জীবন বোধহয় অতো সহজ নয়। অগোচরের কোনো অদৃশ্য হাত অনবরত হিসেব মিলিয়ে যাচ্ছে, সে-ই সব ; আমার বোঝাপড়ার সঙ্গে কোথাও তার কিছু মেলে না। অতর্কিত এই ঘটনাগুলো নিয়ে যখন ভাবি, ঠাণ্ডা হয়ে আসে হাত পা। যেন সবই অবাস্তর। আমার শরীর আমার মন, আমার কাজকর্ম আর ঘোরাফেরা—এর কোনোটির ওপরে কোনো অধিকার নেই আমার ; সমস্ত নিয়ন্ত্রণ করছে অদৃশ্য এবং ভয়ঙ্কর কোনো শক্তি! হয়তো অপার্থিব, তার বিরুদ্ধে আমি কিছুই করতে পারি না।

মহীতোষ সেদিন বেশ তাড়াতাড়ি ফিরলো। সাধারণত সকালে কাজে বেরুলে সন্ধ্যের পর ফেরে, দুপুরে কোনোদিন খেতে আসে, কোনোদিন আসে না—আগে থেকেই বলে যায়। সন্ধ্যের পর আমরা

কোনোদিন বেরুই ক্লাবে বা পার্টিতে বা বন্ধুদের বাড়িতে। কোনো কোনোদিন এর সবগুলোই চলে আসে আমাদের বাড়িতে। তারপর রাত হয়, ভোর হয় দেরিতে। এইভাবেই কেটে যায় দিন।

কিন্তু ব্যতিক্রমও তো আছে। ভালোই লাগে যদি হঠাৎ এক আধদিন ছেদ পড়ে এই প্রাত্যহিকতায়, রুটিন-বাঁধা দিনযাপনে। মহীতোষকে তাড়াতাড়ি বাড় ফিরতে দেখে খুশি হলাম আমি।

মহীতোষ ঘরে ঢুকলো, থমথমে চোখে তাকালো আমার দিকে, বাথরুমে গেল। মুখ বেশ গম্ভীর ও কঠোর। বাথরুমের ভিতর থেকে জলের শব্দ পেলাম. বোধহয় চান করছে। সাধারণত এসব সে রয়ে সয়ে করে। বাইরে থেকে ফিরেই জুতো খুলে সিগারেট ধরায়, সোফায় বসে ঝিমোয় কিছুক্ষণ—লঘু গলায় আলাপ করি আমরা। তারপর ওঠে, চা তৈরি হতে হতে ঘুরে আসে বাথরুম থেকে। আজ ওর তাড়াতাড়ি ফেরায় ব্যতিক্রম ছিলো, পরবর্তী ব্যবহারে ব্যতিক্রমটা আরো বড়ো হয়ে দেখা দিলো।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে সটান ড্রইংরুমের দিকে যাচ্ছিলো মহীতোষ। আমি বললাম, 'তোমার কি শরীর ভালো নেই।?'

'কেন!'

মহীতোষের গলার স্বর অন্যরকম। ঠিক রূঢ় নয়, নিরুত্তাপ। এ-রকম কণ্ঠস্বরের মানে হয় না কোনো।

অস্বস্তিটা সইয়ে নিতে যেটুকু সময় লাগে, তারপরেই আমি বললাম 'হঠাৎ চান করলে যে!'

মহীতোষ একটা সিগারেট ধরালো। জবাব দিতে সময় নিলো।

'গায়ে অনেক ময়লা জমেছিলো, ধুয়ে নিলাম। পাপের বোঝা কী সহজে নামে!'

আমি কিছুই বুঝলাম না। হয়তো মেজাজ খারাপ, হয়তো কোনো কাজে অসফল হয়েছে—বড্ড স্পর্শকাতর, কারুর কোন কথায় অপমানিত হলেও হতে পারে। যাই ঘটে থাককু আমি তোমার স্ত্রী,

তোমার সবচেয়ে কাছের জন, আমার সঙ্গে এমন ব্যবহারের মানে কী! আমাকে বলো, বলো কী হয়েছে, বলবে না!

হাঁটুর ওপর আর একটা পা তুলে নিচু হয়ে পায়ের নখ খুঁটছে মহীতোষ; সিগারেটটা পুড়ে যাচ্ছে আপনমনে। স্থির দাঁড়িয়ে আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম—আমাকে বলো, বলবে না! কী এমন দুঃখ তোমার, কোন পাপের কথা বলছো, আমার কাছে মন খুলতে কিসের অসুবিধা! উত্তর না পেয়ে তাড়াতাড়ি চা আনতে ছুটলাম আমি।

মা মারা গিয়েছিলেন আমার ফ্রক পরার বয়সে, নারীত্ব বা সতীত্ব সম্পর্কে যখন কোনো ধারণাই জন্মায় না। সঙ্গী বলতে ছিলেন বাবা। কোমল প্রকৃতির মানুষ। সম্ভবত সেইজন্যেই একটু বিরুদ্ধ স্বভাব গড়ে উঠেছিলো আমার; চটপটে ও জেদি, সামান্যতেই হয়ে পড়তাম ক্ষুণ্ণ, আবেগ নিয়ে যেতো ভাসিয়ে। বিয়ের পরও স্বভাবটা পুরোপুরি যায় নি। প্রেমিকার আড়াল দিয়ে যাকে রেখেছিলাম ঢেকে, স্ত্রী তাকে খোলাখুলি এনে দাঁড় করালো। আমার শাশুড়ী সম্ভবত ব্যাপারটা লক্ষ করেছিলেন; মমতা দিয়ে শোধরানোর চেষ্টা করতেন আমাকে। আগুন দিয়ে কি আগুন নেভানো যায়, বৌমা! বলতেন, পুরুষের রাগের সামনে জল হয়ে থাকাই ভালো। দেশলাই কাঠি. জ্বলে উঠেই নিভে যায় আবার। কক্ষনো ঘাঁটাতে যেও না। কথাটা যে কাজের তা বুঝতে সময় লাগেনি আমার। মহীতোষের সঙ্গে ব্যবহারেও এটা মেনে চলতাম আমি। আজও তেমনি হলো, অভিমানটা পুষে রাখলাম মনে। ঠিক করলাম ঘাঁটাবো না। আর, সত্যিই তো, কোথায় কী হয়েছে আমি যার কিছুই জানি না—নিছক অনুমানের ওপর কোন কথা, কোন আবেগকে দাঁড় করাবো!

কিন্তু চায়ের ট্রে হাতে ঘরে ঢুকেই ভারসাম্য হারিয়ে ফেললাম আমি। এই বিকেলেই, দেখলাম, ড্রিঙ্ক নিয়ে বসেছে মহীতোষ। চোখ দুটো বন্ধ; সিগারেটটা অ্যাসট্রের ওপর নামানো। পোড়া গন্ধ উঠছে।

'চা এনেছিলাম—'

'রেখে যাও।'

সুতো ছিঁড়ে গেল। শব্দ করে টি-পয়ের ওপর ট্রে-টা নামিয়ে রাখলাম আমি।

'ব্যাপার কী! বিকেলেই মদ গিলতে শুরু করলে যে!'

'ইউ শাট্ আপ্!' মহীতোষ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, 'কী করবো না করবো, সব কৈফিয়ত কি তোমাকে দিতে হবে!'

কী হলো কিছুই বুঝলাম না। তাকিয়ে দেখলাম মহীতোষ চোয়াল শক্ত করে যাচ্ছে। আকস্মিক চিৎকারে নাড়ির স্পন্দন ততোক্ষণে দ্রুত হয়েছে আমার, ঝিমঝিম করছে মাথা। চাপা গলায় বললাম, 'অসভ্যের মতো চেঁচিও না। লোকজন আছে, শুনছে। গলার জোর থাকলেই চ্যাঁচাতে নেই!'

'আলবৎ চ্যাঁচাব!' মহীতোষ উঠে দাঁড়ালো। হাতের মুঠোয় কাঁপছে গ্লাসটা, সেটা আছড়ে ফেললো মেঝেয়। 'ডার্টি বীচ্! আমি বাড়ি থাকি না, সেই সুযোগে প্রেম করতে যাও—'

'মহীতোষ!' শক্ত করে ধরার ফলে সোফার কভারটা গুটিয়ে এল হাতের মুঠোয়। 'কী বলছো তুমি!'

'কী বলছি তা তুমি ভালো করেই জানো। তুমি শেখরের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে গিয়েছিলে আজ! বলো, আমি ব্লাফ্ দিচ্ছি—'

আস্তে ঘাড় নাড়লাম আমি, 'গিয়েছিলাম! তার সঙ্গে এ সবের কী সম্পর্ক! কে কী বলেছে তোমাকে! শেখর?'

মহীতোষ তাকিয়ে থাকলো আমার দিকে। আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো। চুল চেপে ধরলো হাতের মুঠোয়।

'বলেছে শেখর, তোমার প্রেমিক। আনন্দ চেপে রাখতে পারেনি।'

আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো। ঝট্কা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুত ছুটলাম টেলিফোনের দিকে।

'কী বলেছে শেখর আমি জানতে চাই। আমি ওকে খুন করব—' রিসিভারটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিলো মহীতোষ। দাঁতে ঠোঁট

চিবিয়ে বললো, 'খুন আমি তোমাকে করবো। তোমার যতো প্রেমিক আছে সকলের সামনে খুন করবো। একটা নষ্ট মেয়েমানুষকে কি করে টিট্‌ করতে হয় আমি জানি।'

কতোদিন হয়ে গেল, এখনো আমার কানে স্পষ্ট বাজছে মহীতোষের কণ্ঠস্বর। চোখ খুললেই দেখতে পাই ওর ক্রূর দুটো চোখ—যেখানে শুধুই ক্রিমির মতো ছটফট করছে সন্দেহ ।

ছয়

লিফ্‌ট্‌ আসতে দেরি করছিলো।

মিস্টার সরকার বসেন চারতলায়। আপাতত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। বেঁটে চেহারার একটি লোক আমার খুব কাছে এসে দাঁড়ালো, নিঃশ্বাস ফেললো শব্দ করে। কুঁতকুতে চোখের দৃষ্টি মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধে হয় না।

দেখতে দেখতে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেল। ইতিমধ্যে লিফ্‌ট্‌ এলো এবং সম্পূর্ণ খালি হতে না হতেই গোটা ভিড়টা ঢুকে পড়লো ভিতরে। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম! দেখাদেখি লোকটিও; লিফ্‌ট্‌ উঠে যাবার পর সোজাসুজি তাকিয়ে থাকল আমার দিকে।

অস্বস্তিকর অবস্থা! আবার লিফ্‌ট্‌ নেমে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাকে এবং লোকটি তাকিয়ে থাকবে একই ভাবে, গিলবে, এই চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠল পা দুটো। লোকচক্ষু উদার হয়ে আছে সর্বত্র; দু' এক মুহূর্তের অস্পৃশ্যতার জন্যে ছটফট করে ওঠে নিঃশ্বাস। অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারি, যেখানেই যাই নাম পদবীহীন দু'টি চোখ সর্বত্র অনুসরণ করছে আমাকে; ঘৃণায় হোক বা লোভে—তাদের অস্বস্তিকর উপস্থিতি এড়ানো যাবে না। শরীর, শরীর! পাই না একজনকেও যে সুস্পষ্ট চোখ তুলে তাকাবে আমার চোখে। না কি ভুল করছি; কোথাও না কোথাও কেউ আছে, আমিই খুঁজে পাচ্ছি না!

চারতলা পর্যন্ত উঠতে অনেকগুলো সিঁড়ি ভাঙতে হবে জেনেও আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম আমি। তিনতলা পর্যন্ত কোনরকমে এসে হাঁপ ধরে গেল বুকে। হঠাৎ যেন কেমন অশান্ত হয়ে পড়েছি। অথচ এ-রকম হবার কথা নয়। আমার শরীরে কোনো অসুখ নেই, স্বাস্থ্যও নিখুঁত। বুঝতে পারছি না, হয়তো এই ক্লান্তি ও যন্ত্রণার কারণও আমার বর্তমান মানসিকতা—এক শূন্য থেকে আর এক শূন্যের দিকে এগুনো ভাবনাগুলো ক্রমশ স্তিমিত করে দিচ্ছে আমাকে!

এইভাবে হঠাৎ চলে আসার কি কোনো প্রয়োজন ছিলো! মিস্টার

সরকার আমার পরিচিত হতে পারেন, হতে পারে তিনি স্নেহ করেন আমাকে। স্নেহ না, করুণা! যাই হোক তাঁর মতো একজন ব্যস্ত মানুষকে কিছু না জানিয়ে এসে দেখা করা কি ঠিক হলো! এই মুহূর্তে তিনি হয়তো জরুরী কাজকর্মে ব্যস্ত, ভাবতে পারেন আমি তাঁর ভদ্রতার সুযোগ নিচ্ছি। এমনও হতে পারে তিনি নেই, দেখা না পেয়ে এই পথেই আবার ফিরে আসতে হবে আমাকে। তাহলে কি ফিরে যাবো?

এতো দূরে এসে কিছু না জেনে ফিরে যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা ভাবতে ভাবতে চারতলা পর্যন্ত উঠে এলাম আমি। কাচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই রিশেপসনিস্ট আমাকে দেখে হাসলো। হাসিতে মাপা অভ্যর্থনা। এইরকম কাজ হয়তো ভালোই পারবো।

মিস্টার সরকারের খোঁজ করতে আমার কোনো অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে কি না জিজ্ঞেস করলো মেয়েটি। আমি বললাম, 'না'। উত্তরে মেয়েটি এমনভাবে তাকালো যার অর্থ, তবে? তারপর বললো, 'সরি। উনি একটা মিটিংয়ে আছেন।'

সবকিছুই মেয়েটি বললো হাসিমুখে। তারপর উল বোনায় মন দিলো।

তার মানে এখন দেখা হবে না। আমি চলে যেতে পারি।

কিন্তু আমি যাবো না। নিজের উপর বিশ্বাস কম; আমি জানি, আজ এবং এখনই দেখা না হলে উৎসাহ কমে আসবে, এর পর অনেকদিন হয়তো মিস্টার সরকারের সঙ্গে দেখা হবে না; থাকুন তিনি ব্যস্ত, আমি যে এসেছি এটা তাঁকে জানানো দরকার।

'মিস্টার সরকারকে একটা খবর পাঠানো যেতে পারে?'

'কি খবর?' মেয়েটি নতুন করে শুরু করলো, 'বলুন?'

'আমার নামটা বললেই হবে—'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' ভিজিটরস্ স্লিপের প্যাডটি বাড়িয়ে দিলো মেয়েটি। 'এখানে আপনার নাম লিখুন।'

প্যাডটি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলাম আমি। কী লিখবো? মিসেস নমিতা চৌধুরী? এই নামটিই চট করে মাথায় এলো। সায় পেলাম না মনে। এটা ঠিক, মিসেস নমিতা চৌধুরী মিস্টার সরকারের সঙ্গে দেখা করতে আসেনি; প্রায় ছ' বছরের বিবাহিত জীবনে কোনোদিন সে এই সমস্যার কথা ভাবেনি। ইতিমধ্যে আমি মাথার সিঁদুর তুলে ফেলেছি, খুলে ফেলেছি হাতের নোয়া। চোরা ব্যথার মতো নামটা তবু ঘুরছে সঙ্গে সঙ্গে। বিয়ের আগে আমার একটা পদবী ছিলো—মুখার্জী, বিচ্ছেদের পরে কেউ কি মিস্ ব্যবহার করে। কিন্তু এর কোনোটা দিয়েই নিজেকে অবিলম্বে চেনানো যাবে না।

সামান্য নামই এখন আমার কাছে সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। শীততাপের মধ্যে দাঁড়িয়েও ঘামতে লাগলাম আমি।

সম্ভবত আমি একটু বেশি সময় নিচ্ছি। উলবোনা থামিয়ে মেয়েটি আমাকে লক্ষ করছে দেখে অস্বস্তি বেড়ে গেল। দ্রুত হাতে লিখলাম, মিসেস নমিতা চৌধুরী, এবং তারপর ব্র্যাকেটে, নমি। আশা করি এতেই হবে। কিছুটা স্বস্তি লাগলো।

মেয়েটি বললো, 'আপনি অপেক্ষা করুন। আমি খবর পাঠাচ্ছি।'

অপেক্ষা করতে হবে, ভাবলাম, হয়তো অনেকক্ষণ। সামান্য কাতর বা ব্যস্ত হলাম না আমি। এটা, এই অপেক্ষা, এমনই একটা কিছু যার মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য; যদিও জানি উদ্দেশ্যটাও জোর করে তৈরি করে নিতে হচ্ছে আমাকে। আমার একটা কাজ দরকার—ভীষণভাবে দরকার। প্রতিটি মুহূর্তের কঠিন ভার বাসী কফের মতো থিকথিক করছে বুকে, যদি পাই—যদি একটা কাজ জুটে যায়—হয়তো ভুলে থাকতে পারবো নিজেকে।

চিন্তাগুলো আবার ফিরে আসছিলো। আবার বিষণ্ন বোধ করতে শুরু করেছি, রিশেপসনিস্টের গলা শুনলাম।

'মিসেস চৌধুরী, আপনি মিস্টার সরকারের সঙ্গে দেখা করতে পারেন।'

'ধন্যবাদ।'

এতো তাড়াতাড়ি যে আমাকে ডাকা হবে ভাবিনি। বেয়ারার পিছুপিছু মিস্টার সরকারের চেম্বারের দিকে যেতে যেতে চমৎকার হাওয়া খেলে গেল বুকের ভিতর। ইতিমধ্যেই ক্লান্ত বোধ করতে শুরু করেছিলাম আমি। মিস্টার সরকার আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন।

বড়ো সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওদিকে আর একজন বসে। সম্ভবত দু'জনে কিছু আলোচনা করছিলেন, আমি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ছেদ পড়লো।

'এসো।' মিস্টার সরকারকে ঢিলেঢালা হতে দেখলাম। 'ক'দিন থেকেই ভাবছি তোমার কথা।'

'আসতে পারিনি—'

বসতে বসতে আড়চোখে অন্য লোকটিকে দেখে নিলাম আমি। গায়ে ছাইরঙ স্যুট, পরিষ্কারভাবে কামানো গাল। আমার উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে সিগারেটে টান দিলেন ভদ্রলোক।

'তারপর ? তুমি কি বাড়ি বদল করেছো ?'

'হ্যাঁ কালই।' পরের কথাটার অভাবে গ্লাস-কভারের ওপর আঙুল ঘষলাম দ্রুত। এখন না এলেই ভালো হতো। ভাবলাম, হয়তো এখনই আমার আর একদিন আসবো বলে উঠে পড়া উচিত।

'তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই।' ইংরেজীতে বললেন মিস্টার সরকার, 'সুব্রত মিত্র। আর ইনি মিসেস চৌধুরী—আই মীন—'

মাত্র কিছুক্ষণ আগে আমিও একই দ্বিধায় পড়েছিলাম। আর কি ভাবে তিনি আমার পরিচয় দেবেন ! মিস্টার সরকারের বিব্রত ভাব লক্ষ করে তাড়াতাড়ি বললাম, 'আমি বোধহয় আপনাদের ডিসটার্ব করলাম।'

'নট অ্যাট অল্। আমাদের ডিসকাসন শেষ হয়ে গিয়েছিলো।'

ভদ্রলোক, সুব্রত মিত্র, এতোক্ষণে পরিষ্কার তাকালেন আমার দিকে। পাশ থেকে মাঝবয়েসী লাগছিলো, এখন দেখলাম তা নয়।

যুবকই বলা যেতে পারে। কতো বয়স হতে পারে! পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ?

'আপনাকে খুব চেনা চেনা লাগছে। ফ্যামিলিয়ার ফেস! কোথায় দেখেছি বলুন তো?'

'আমি তো ঠিক—'

অন্তত আগে কখনো ভদ্রলোককে দেখেছি বলে মনে পড়লো না। বিব্রত হয়ে চোখ নিচু করলাম আমি। মহীতোষও এইভাবে বলেছিলো, মনে পড়ল, ম্যাল, দার্জিলিংয়ে—প্রথম সূর্যের ঝকঝকে আলোয় দাঁড়িয়ে। আলাদা কণ্ঠস্বর। সে-বছরই আমি বি. এ. পাশ করেছি।

'না সুব্রত, তুমি নিশ্চয় ওকে ছাখোনি আগে।' হালকা গলায় বললেন মিস্টার সরকার, 'যে-কোনো সুন্দরী মহিলাকে দেখলেই চেনা লাগে আমাদের। ছাট্‌স ইট্।'

স্তুতি আমার গা-সাওয়া হয়ে গেছে। তবু কথাটা শুনে, ভিতরে ভিতরে কেঁপে উঠলাম।

'ক্যাডবী, ক্যাডবী।' রসিকতাটা হজম করার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন সুব্রত। ঈষৎ সপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'দে লীভ ইন আওয়ার ড্রিম্‌স্।'

শব্দ করে হেসে উঠলেন মিস্টার সরকার। আমিও না হেসে পারলাম না। এখানে আসার পর এই প্রথম স্বাভাবিক বোধ করলাম।

'সুব্রত ইজ ফ্রম আওয়ার অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী—'

মিস্টার সরকার একটা কোম্পানীর নাম বললেন। হয়তো শুনে থাকবো কখনো। আমি চুপ করে থাকলাম। এখন কিছু বলা মানেই কথা বাড়ানো, তার ওপর বুঝতে পারছি না আমি ওদের কতোটা অসুবিধে করলাম।

সুব্রত উঠে দাঁড়ালেন। মিস্টার সরকার বললেন, 'ইউ গো অ্যাহেড ডেভলপমেণ্ট যদি কিছু হয় আমি জানাবো।'

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। সুব্রত হাসলেন, প্রত্যুত্তরে আমিও—মাপা হাসি, যা একবারে একজনকেই উপহার দেওয়া যায়।

'তারপর, নমি, কেমন আছো বলো?' অন্য কিছু বলার আগে সহজ হবার ভূমিকা করলেন মিস্টার সরকার, 'এখন তো মোটামুটি সেটেল্‌ড্‌?'

আমি হাসলাম। ঘর যথেষ্ট ঠাণ্ডা থাকা সত্ত্বেও অল্প অল্প ঘেমে যাচ্ছি এখনো। খিদেও পাচ্ছে। এখান থেকে বেরিয়ে একটা কোথাও ঢুকে পড়বো, খাবো। তারপর কী করবো এখনো জানি না। মাত্র দুপুর পর্যন্ত এগোলাম। তারপরও বিকেল আছে, আছে সন্ধ্যা ও রাত। এমন কি হয় না, আজ রাতে একসঙ্গে অনেকগুলো ঘুমের বড়ি খেয়ে ফেললাম এবং কাল সকালে আর উঠলাম না।

মেরুদণ্ড বেয়ে লম্বা রেখায় শীত নেমে গেল। না আমি বাঁচতে চাই। অনেক, অনেকদিন ধরে বাঁচতে চাই।

বেয়ারাকে ডেকে কফি দিতে বললেন মিস্টার সরকার।

'না 'ক ঠাণ্ডা কিছু?'

'কফিই ভালো।'

বেয়ারা চলে গেল। মিস্টার সরকার হয়তো এবার কাজের কথায় আসবেন, আমি ভাবলাম। কাজের মানুষ, আর বেশি সময় নষ্ট করা উচিত হবে না।

'আপনি কি কিছু ভেবেছেন?'

সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিলেন না মিস্টার সরকার। ফোন তুলে কাকে কি বললেন খেয়াল করলাম না। অনেকক্ষণ ধরে একইভাবে বসে আছি আমি। সম্মুখস্থ এই ভদ্রলোক আমার কেউ নন, তবু এঁকে ধরেই উদ্দেশ্যহীনতা থেকে উদ্দেশ্যে পৌঁছোনোর অসহায় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এই মুহূর্তে স্পষ্ট করুণাপ্রার্থী ভিন্ন আমি আর কিছুই নই। হাই উঠতে মুখে চাপা দিলাম আমি।

'তোমার কথা অনেককেই বলেছি।' মিস্টার সরকার বললেন, 'এই তো সুব্রতকেও বলছিলাম। যে-কোনো কাজতো তোমার পছন্দ হবে না। একটা কাজ অবশ্য এখুনি হয়ে যেতে পারে—'

উৎসাহে চাঞ্চল্য অনুভব করলাম। সম্ভবত আমি একটা কাজ পেয়ে যাবো।

'গাইডের কাজ কেমন লাগবে? সাপোজ, ফরেন ট্যুরিস্ট যারা আসে, কলকাতা বা তার আশেপাশের জায়গাগুলো তাদের ঘুরিয়ে দেখানো—'

'ভালোই তো!'

'আই থট্ অ্যাজ মাচ্। তুমি তো এই শহরটাকে চেনো। চেনো না?'

আমি কি হ্যাঁ বলবো? এটা সেই ধরনের প্রশ্ন, তুমি কি নিজেকে চেনো? যাবতীয় প্রস্তুতি ধ্বসে পড়ে মুহূর্তে।

শহর বলতে তিনি কি বোঝাতে চাইছেন বোধগম্য হলো না। বস্তুত, আমি জানি খুব কম। এই শহরে আমার জন্ম, বলতে গেলে আঠাশ বছরের পুরোটাই কেটে গেল এখানে। তবু মাঝে মাঝে কলকাতাকে মনে হয় নিরুদ্দিষ্ট, মনে হয় অস্পষ্ট, স্বপ্নের দেখা। গোপনে ভোল পাল্টানোর মতো চেনা দৃশ্যগুলি লুকিয়ে পড়ে হঠাৎ। ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে নিজের গায়ের রঙ বদলে যেতে দেখে বিস্ময়ে মূক হয়ে আসে সমস্ত চেতনা, অনেকটা তেমনি, মাঝে মাঝে এই শহর হতবাক করে রাখে আমাকে। জানাশোনার ভিতর থেকেই, অবচেতনায়, স্মৃতি যায় হারিয়ে—মাথা খুঁড়লেও তখন আর তাকে খুঁজে বের করা যায় না। কলকাতা আমার স্মৃতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। এই মুহূর্তে চোখের সামনে ম্যাপ ধরার মতো তাকে খুঁজলাম আমি। এবং হঠাৎই অনুভব করলাম, পরিবর্তে আমি শুধু নিজের কথাই ভেবে যাচ্ছি। প্রয়োজনটাই আপাতত বড়ো কথা। চিনি না চিনি, ভাবলাম, কাজটা পেলে অক্ষমতাগুলো ঢেকে রাখা কী আর এমন শক্ত!

'কী হলো! কী ভাবছো?'

'কিছু নয় তাড়াতাড়ি বললাম আমি, 'মনে হয় কাজটা আমি ভালোই পারবো।'

'গুড্।' মিস্টার সরকার থেমে পড়ার ভঙ্গী করলেন। 'তাহলে এটাই ডিসাইড করে ফেলা যাক। তুমি কি কাল বা পরশু আমাকে একবার ফোন করতে পারবে? আই হোপ তার মধ্যেই কিছু একটা হয়ে যাবে।'

এবার আমার ওঠা উচিত। কাজটা কোথায় এবং কেমন আপাতত তা না জানলেও চলে। মিস্টার সরকারের গলায আশ্বাস আছে, নেই নিশ্চয়তা—কাল বা পরশু বা আরো কয়েকদিন পরে আমি হয়তো নিশ্চিত করে কিছু জানবো। মানুষের মুখ চোখ দেখলে আজকাল কেমন অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, চিন্তা ও কাজের মধ্যে সূত্র খুঁজে পাই না কোনো। সন্দেহে কালো হয়ে ওঠে মন।

কিছু নিতে হলে কিছু দিতে হয়। খানিক আগেই মিস্টার সরকারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে, কথাটা মনে হয়েছিলো আমার। হয়তো ভুল ভেবেছি। মিস্টার সরকারের ওপর আমি নির্ভর করতে পারি।

ফেরার সময় লিফ্টের জন্যে অপেক্ষা করলাম না। কয়েক ধাপ সিঁড়ি নামার পরই এতোক্ষণ বসে থাকার জড়তাটা কেটে গেল। ঝরঝরে লাগছিলো—যে-কোনো একটা কাজ হয়ে যাবে, ভেবে নয়; বরং খুশি হলাম, মিস্টার সরকারের কঠিন ব্যূহ থেকে অবশেষে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। আবার ক্রমশ ফিরে আসছি নিজের মধ্যে—ভাবনা গুলো ফিরে আসছে, শূন্য মাথায় এখন যে-কোনো চিন্তার জায়গা হবে।

ফুটপাথ ধরে হেঁটে যেতে যেতে প্রখর সূর্যের তাপ ক্রমশ ছড়াতে লাগলো শরীরে। হট্ বাথ্ নেওয়ার মতো, ভালোই লাগলো। আপাতত এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত হাঁটবো ও কোনো রেস্তোরাঁয় ঢুকে কিছু খেয়ে নেবো। চিকেন বিরিয়ানি। আমার খুব পছন্দ। না কি চীনে খাবার। বরং আইসক্রীম খাবো। ঠোঁট দুটো শুকিয়ে আসতে জিভ বুলিয়ে নিলাম, আজকাল ঘনঘন তেষ্টা পায়। না, হাল্কা কিছুই খাওয়া ভালো। তারপর কী করবো জানি না।

মাত্র বারোটা। রেস্তোরাঁয় ভিড় কম! নির্জনতম টেবিলটি খুঁজে নিয়ে বসলাম আমি।

পরিষ্কার আত্মভুকের অনুভূতি—খাবারগুলো কিছুতেই নামছে না গলা দিয়ে। অনতিদূরে বসে কয়েকটি যুবক, সম্ভবত কলেজের ছাত্র, স্ট্র ঠোঁটে বসে উঁচু গলায় কথা বলছে। তারা মেরিলিন মনরো ও অ্যানিটা একবার্গ ও ওয়েল্চ্-এর কথা বলছিলো। রোগা, চিবুকে ছুঁচলো দাড়িঅলা ছেলেটি এতোক্ষণ চুপচাপ ছিলো, হঠাৎ বললো কাল রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে সে এলিজাবেথ টেলরকে চুমু খেয়েছে। শক্ত চেহারার ছেলেটি জিজ্ঞেস করলো স্বাদ কেমন, এবং তারপরেই, আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে পাশের ছেলেটিকে কনুই দিয়ে গুঁতোলো। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

কিন্তু, ছুরি দিয়ে চেরার মতো, ওই সামান্য কথাবার্তা ও তাকানো ও কনুইয়ের গুঁতো—যেটা অসভ্যতা ছাড়া কিছু নয়—তীব্র ভাবে নাড়িয়ে দিলো আমাকে। ঠিক আগের মুহূর্তটি পর্যন্ত নিজেকে অসম্ভব নিঃসঙ্গ লাগছিলো আমার। বিশেষ কিছুই না ভেবে প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়ার মুহূর্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম, প্রায় বাতিল হয়ে যাওয়ার অনুভূতি—যা মানুষ শুধু বুড়ো বয়সে পৌঁছেই অনুভব করে। এটা এমনই একটা ব্যাপার, এমন দুঃসহ, নিজে পর্যন্ত যা বিশ্লেষণ করতে পারি না। সম্ভবত আর একবারই এ-রকম বিপর্যস্ত বোধ করেছিলাম আমি: মার মৃত্যুর পর, আমার তেরো চোদ্দ বছর বয়সে। এক ধরনের অনুভূতি, পল্কা ত্রিপলের মতো যা নামিয়ে আনে আকাশটাকে, বুকের ভিতর গরগর করে মেঘ; চোখে জল আসে না, তবু কান্না ছুঁয়ে যায় রক্ত ও নিঃশ্বাস। সত্যি সত্যিই কয়েকটি যুবকের আল্গা ও অসভ্য আলাপ আমার মূল পর্যন্ত নাড়িয়ে দিলো। হঠাৎ অনুভব করলাম, আমার প্রয়োজনীয়তা ফুরোয়নি। ইচ্ছে ও চেষ্টা থাকলে এখনো যে-কোনো দূরত্বকে ইশারায় টেনে আনতে পারি কাছে।

যুবকদের চোখ তখনো আমার ওপর। বিল মিটিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে

বেরিয়ে যেতে যেতে আমি প্রথমে বুক ও কোমর এবং তারপর পিঠ ও নিতম্বের ওপর তাদের সমবেত দৃষ্টি জিভের মতো ছুঁয়ে যাচ্ছে অনুভব করলাম। রাস্তায় চচ্চড়ে রোদের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে কেঁপে উঠলো সর্বাঙ্গ।

মনঃস্থির করে ফেললাম। মহীতোষ—ইউ ব্লাডি পিগ্—আমি তোমার তোয়াক্কা করি না। আমি তোমার স্ত্রী নই, আমার ওপর আর কোনো অধিকার নেই তোমার, নিজেকে যে-কোনোভাবে ব্যবহার করার স্বাধীনতা এখন পুরোপুরি আমার। তোমাকে ছাড়াও আমি বাঁচতে পারি ; এবং কী ভাবে, ক্রমশ দেখাবো তোমাকে। কাল যা করেছি, আজও তাই করবো। এখনো আমার বুকে লেগে আছে মনীশের দাঁতের দাগ, ব্যাগের মধ্যে মনীশের টাই, কাল রাতে চলে যাবার সময় যেটা ও ফেলে গিয়েছিলো। আমাকে দ্যাখো, সোনার থামের মতো আমার শরীর! নতজানু হয়ে যেদিন তোমার হাঁটু আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলাম—মহীতোষ, আমাকে মেরো না, প্লীজ, তোমাকে আমি ঠকাইনি, কেন শুধু শুধু সন্দেহ করছো আমাকে ; তুমি পদাঘাত করেছিলে বুকে! সেই বুকে এখন সুস্পষ্ট দাঁতের দাগ লুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি। যন্ত্রণা একই রকমের, তবু তফাতটা থেকে গেল। স্ত্রীত্ব কাকে বলে আমি বুঝেছি। সন্দেহ সত্যি হলে সেদিন হয়তো অতোটা কাতর ও অসহায় হয়ে পড়তাম না।

কাছাকাছি পাবলিক বুথ থেকে ফোন করলাম মনীশকে।

মনীশ ভাবতে পারলো না যে এপাশে আমিই রয়েছি। ইতস্তত করছিলো। কী বলতে হবে জানে না।

আমার হাসি পাচ্ছিলো। হাসতে হাসতেই বললাম, 'কাল তোমার টাইটা ফেলে এসেছো। সেটা ফেরত দিতে চাই।'

'কী ফেলে এসেছি আমিই জানি!' মনীশ বললো, ওর গলা রীতিমতো ভারী। 'নমি, তুমি কোত্থেকে কথা বলছো?'

'রাস্তা থেকে—'

'কোথায় বলো ? আমি এক্ষুনি আসতে পারি।'

দরকার হবে না। আমি এখন খুব ব্যস্ত।'

মনীশ চুপ করে গেল।

আমি বললাম, 'তাহলে, তোমার টাইটা—'

'নমি, তুমি কি সিরিয়াসলি বলছো ?'

আমি উত্তর দিলাম না। ফোনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম মনীশ দাঁতে দাঁত ঘষছে, হাত বুলোচ্ছে কপালে। মাংসের গন্ধে থমথম করছে হাওয়া।

আমার হাত কাঁপতে লাগলো। বোধহয় রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেই ভালো হতো। এইসব সময়ে নিজেকে দুর্বল লাগে ক্রমশ। আকস্মিক ভাবে কালকের ঘটনাটা যদি না ঘটতো, তাহলে মনীশ সম্পর্কে আমি কিছু ভাবতাম না।

আবার ক্লান্ত লাগছে। মনীশ বললো, 'তুমি কি আজ বাড়ি আছো ?'

'কেন ?' অর্ধেক গলায় জিজ্ঞেস করলাম আমি।

মনীশ বললো, 'আমি আসবো—'

জবাব না দিয়ে ফোন ছেড়ে দিলাম। হ্যাঁ বা না, এখন যে-কোনো উত্তরই নিরর্থক। মনীশ আসবেই। কাল ও যা করেছিলো আজও তাই করবে। এতোক্ষণ সেই আমার সঙ্গে ও কথা বললো, যাকে অস্থির হাতে কাল সে অনাবৃত করেছিলো, যার শরীরের দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, কী নিখুঁত শরীর তোমার !

জানি না এখন কী করা উচিত। আবার রাস্তায় নামলাম। এবং ভাবলাম, তবু রাস্তা আছে।

সাত

আমার কিছুই নেই। কাজ নেই, নেই সম্পর্ক, সারাক্ষণ নিঃসঙ্গ। পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া কিছু জমানো পুঁজি আছে ব্যাঙ্কে; আপাতত টাকাকড়ির চিন্তাও নেই। ইচ্ছে করলে শরীর ছাড়া আর কিছুই খরচ করতে পারবো না।

আশ্চর্য, এই আমি—আমারও দিন কেটে যেতে লাগলো। ভাগ্যিস আমাদের অভিজ্ঞতার আড়ালেই ঘটে যায় দিন ও রাত, ক্যালেণ্ডারের তারিখ যায় বদলে, না হলে এই অসহ্য সময়হীনতার মধ্যে থেকে আমি কি করে বুঝতাম সময় কেটে যাচ্ছে!

অগোচরের এই নিঃশব্দ ও অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা আজকাল প্রায়ই অন্যমনস্ক করে দেয় আমাকে। একটা চাকরি হয়তো হবে। হলে ভালো, কাজ নিয়ে ইদানীং বড়ো একটা ভাবি না। চেয়ারে বসে জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকি লনের দিকে। বর্ষার জল কিংবা ভিজে পাতার সবুজ গন্ধ জড়িয়ে যায় নিঃশ্বাসের সঙ্গে।

সেদিন দুপুরে একটা ঘুঘু উড়ে এসেছিলো, ছোট লনের ওপর অনেকক্ষণ চরে বেড়ালো, ঘু-ঘু-ঘু-ঘু একটানা ডাকতে ডাকতে হঠাৎই আবার চলে গেল উড়ে। ডাকটা লেগে থাকলো বুকে। চোখ তুলে আকাশে তাকালাম আমি। মেঘের পর মেঘ রঙ পাল্টে ফেলছে ক্রমশ; প্রতিটি রঙই স্বাতন্ত্র্য এনে দেয় চোখে। তারপর হঠাৎই ঝুপ-ঝুপ করে নেমে এলো বৃষ্টি, পিচের রাস্তার ওপর ঘোড়ার খুরের শব্দের মতো শব্দ হতে লাগলো।

দুপুর বলেই সম্ভবত রাস্তা এমন ফাঁকা। আমি তাকিয়ে থাকলাম। হঠাৎ চোখে পড়লো গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একটা ভিখিরি, কোলে হাড়-পাঁজরা বেরুনো এক শিশু, বৃষ্টিতে ভিজে চুপ্‌সে গেছে। ওরা সটান চলে এলো আমার বারান্দায়। আমি ভাবলাম, এবার নিশ্চয়ই কিছু না কিছু চাইবে, সেইভাবেই প্রস্তুত করলাম

নিজেকে। চালটাল এখন দেওয়া যাবে না। মিস্টার লাহিড়ীর দেওয়া লোক শোভার মা কিচেনের সামনে ঘুমুচ্ছে মাদুর পেতে, তাকে এখন ওঠানো যাবে না। বরং ওকে পয়সা দেবো দু' চারটে। ভিক্ষা তো! ওরা বারান্দায় এসে বসলো, কিন্তু একবারও চোখ তুলে দেখলো না। মা তাকিয়ে থাকলো আকাশের দিকে আর বাচ্চাটা ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে মুখের লালা ঘষতে লাগলো বারান্দায়। আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। কোথায় যেন একটা হিসেবের ভুল হয়ে গেছে, আমার সমস্ত ধারণা ভুল হয়ে যাচ্ছে।

'এই, তুমি এখানে কি করছো?'

একটু জোর গলাতেই বললাম। অবাক চোখে ভিখিরি তাকালো আমার দিকে।

'জলটা ধরলেই চলে যাবো, মা। এখুনি ধরে যাবে।'

মেয়েটির গলায় অনুনয় ফুটলো। কথাটার মানে বুঝতে পারলাম না—আমি কি ওকে চলে যেতে বলেছিলাম!

জানি না। যদি সে-রকম কোনো ধারণা করে থাকে, এই ভেবে বললাম, 'বাচ্চাটাকে জলে ভিজিয়েছো কেন। ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করতে পারে তো!'

'কি করবো, মা! যেখানেই দাঁড়াতে যাই, লোকে দূর-দূর করে। সব বাড়িতে তো আর ছাউনি থাকে না!'

কথা শেষ করেই মেয়েটি হঠাৎ হ্যাংলার চোখে দেখলো আমাকে, তার বিষণ্ণ চোখে ফুটে উঠলো একটা চকচকে, অস্থির ভাব। উঠে দাঁড়িয়ে দু' পা এগিয়ে এলো আমার দিকে। তারপর বললো, 'আমাকে কিছু দাও না, মা! তোমার তো অনেক আছে—'

রীতিমতো গোছানো ভাষা; ভিখিরিরা সাধারণত এ ভাষায় কথা বলে না। মেয়েটি যেন আমার দুর্বলতার সুযোগ নিতে চাইলো।

হঠাৎ কেমন রোখ চেপে গেল আমার। বললাম, 'তুমি তো ভিক্ষে চাইতে আসোনি, জল বাঁচাতে এসেছিলে। এখন চাইছো কেন!'

মেয়েটি কেমন থতমত খেয়ে গেল। পিছিয়ে গিয়ে বললো, 'ও মা! ভিখিরি আবার ভিক্ষে ছাড়া কি চাইবে'!

আমি কিছু বলবার আগেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার লাহিড়ীর গলা। 'এই, এই, এখানে কি হচ্ছে! যাও, ভাগো—ভাগো বলছি—'

বাচ্চাটিকে কোলে তুলে মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির মধ্যেই নেমে গেল আবার। রাস্তার কাছাকাছি গিয়ে একবার ফিরে তাকালো। তারপর আর দেখতে পেলাম না।

'কী কাণ্ড!' মিস্টার লাহিড়ী বললেন, 'একেবারে বারান্দায় উঠে এসেছে!'

'বৃষ্টি পড়ছিলো—'

'না, না। আপনার মন খুব সফ্‌ট্‌, তাই বলছেন।' যথারীতি আমাকে দেখে নিয়ে মিস্টার লাহিড়ী বললেন, 'বৃষ্টি ফিষ্টি বাজে কথা। বৃষ্টি তো সারা বছরই পড়ে। নিশ্চয় খবর পেয়েছে আপনি একলা থাকেন, চুরির মতলব কি না কে জানে? এদের আবার গ্যাং থাকে! না, না, কক্ষনো এলাউ করবেন না—'

মিস্টার লাহিড়ীর বোধহয় প্রসঙ্গটা জিইয়ে রাখার ইচ্ছে ছিলো, আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে থেমে গেলেন। একটু অপেক্ষা করে লনে নামলেন; গেটের দিকে এগোচ্ছেন, সম্ভবত গেটটা লাগাবেন এখন। আমি সরে এলাম।

তারপর থেকেই অদ্ভুত একটা বিষণ্ণতায় আমার মন ভারী হয়ে উঠলো। মনে হচ্ছে যে-স্বাধীনতা আর আত্মরক্ষার জন্যে আমি ছটফট করছি, ভিখিরিটা তার মূলে এসে আঘাত করে গেল। কানের ভিতর একটি কথাই ঘুরে ফিরে বাজতে লাগলো, তোমার তো অনেক আছে —তোমার তো অনেক আছে—। খুব ক্ষীণভাবে হলেও আমার মনে হতে লাগলো, কিছু একটা বলা হলো আমার সম্পর্কে, যার অর্থ আমি কিছুতেই ধরতে পারছি না।

হয়তো তেমন কিছুই নয় ব্যাপারটা। ভিখিরি প্রফেট নয় যে মুখ ফস্‌কে কি বলছে না বলছে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে! আর কেউ হয়তো ঘামতো না, কিন্তু কী যে হয়েছে আমার—খুঁটিনাটি যে-কোনো বিষয় নিয়েই বড্ড বেশি ভাবি! ভূতটা কিছুতেই নামল না মাথা থেকে। মেয়েটি কি আমার মধ্যে কিছু লক্ষ্য করেছিলো—অস্বাভাবিক বা অভাবনীয় কিছু, যা শুধু একটি ভিখিরি মেয়ের চোখেই ধরা পড়ে! আমার পরিষ্কার মনে আছে, অনেক কথার পর ওই কথাটা বলেছিলো সে, সরাসরি এসে ভিক্ষার হাত বাড়ায়নি। অথচ, ভিক্ষাই তার জীবিকা—ভিক্ষা ছাড়া সে আর কিছুই চাইতে পারে না।

কী মানে ওই কথাটার, তোমার তো অনেক আছে! কী আছে আমার! আমার গায়ের শাড়ি? কানের দুল? গলার হার? প্রাচুর্যের এইসব নমুনাগুলিই কি ওর চোখ টেনেছিলো? না কি আমার ভিতর পর্যন্ত তাকিয়ে দেখেছিলো মেয়েটি, যেখানে শুধুই দুঃখ আর নিঃসঙ্গতা; ভয়ঙ্কর অসহায়তা হাড়-পাঁজরা-বেরুনো শিশুটির মতো সারাক্ষণ লালা ঝরিয়ে যাচ্ছে!

হয়তো প্রথমটাই ঠিক। স্বাভাবিক বলেই সত্য। কিন্তু, কেমন যেন মনে হলো, হয়তো ভুল করছি আমি, কথাটাকে অতো সহজ করে নেওয়া যায় না। হতে পারে দুঃখ আর অসহায়তা আর নিঃসঙ্গতা তাকেও তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে সারাক্ষণ, অথচ বুঝতে পারছি না ঠিক ঠিক—এই অনুভূতিগুলো সেও ফিরে পেতে চায়! আমি কে? আমিও তো একরকম তারই মতো—অনুচিত ভেবেও একদিন ভিখিরির মতো পা জড়িয়ে ধরেছি মহীতোষের, দাম্পত্য-জীবনের ওপর এতোই লোভ ছিলো আমার! যে-শরীরের জন্যে আমার এতো অহঙ্কার আর অভিমান, ক্ষুধার্তের উত্তেজনায় মনীশের কাছে কি সমর্পণ করিনি তাকে! আর যা চাইছি, সবই তো ওই ভিখিরির মতো!

সমস্ত চিন্তা আমাকে বিষণ্ণ করে রাখলো। এবং অস্থির। নিজেকে

বোঝালাম, এগুলো পাগলামি ; নিছক পাগলামি ছাড়া আর কী হতে পারে ! ভিখিরি ভিখিরিই—খাওয়া, পরা আর মাথা গোঁজার মতো একটু আস্তানা, এছাড়া আর কোনো সমস্যা নেই তার। আমার সঙ্গে কোনো মিল নেই, কিছুতেই নেই। নমিতা, একা থেকে থেকে ভাবনাটা তোমার বিলাস হয়ে দাঁড়াচ্ছে, জোর করে কিছু কি দাঁড় করানো যায় ! ভেবো না, অতো ভেবো না। শেষে কি পাগল হয়ে যাবে !

না, আর ভাববো না। সত্যি সত্যিই একটু বেশি ভাবছি আমি ; ফাঁকা মাথায় সহজেই ভূত ঢুকে পড়ে। প্রবাদটা ছুঁয়ে যেতে মনে মনে হাসলাম আমি।

বৃষ্টিটা ধরে এসেছিলো। মাত্র আষাঢ়ের শেষ। সামনে পড়ে রয়েছে অনেক বর্ষা। তবু আকাশে এখনই যেন শরৎকাল এসে ধরা দিচ্ছে। এরই মধ্যে চমৎকার রোদ উঠে গেল।

ভেবেছিলাম আজ বেরুবো না। কিন্তু সকাল থেকে ফ্ল্যাটের মধ্যে শুয়ে বসে থাকতে থাকতে সময় যেন থেমে দাঁড়িয়েছে এক জায়গায় ; অনেকভাবে চেষ্টা করলাম, আমি আর তাকে টানতে পারছি না। অগত্যা বেরিয়ে পড়লাম।

কোথায় যাবো ঠিক ছিল না। রাস্তায় বেরিয়ে কিছুক্ষণ এলেমেলো হাঁটলাম। মানুষের পর মানুষ, নারী ও পুরুষ, হেঁটে যাচ্ছে এদিক থেকে ওদিকে। রাস্তায় বেরুলে সাধারণত আমি মানুষজনের মুখের দিকে তাকাই না ; যেতে যেতে যদিও টের পাই অনেকের চোখই ছুঁয়ে যাচ্ছে আমাকে। আজ আমি সুস্পষ্টভাবে প্রতিটি মুখ লক্ষ্য করতে লাগলাম। মুখের এতো বৈচিত্র্য আগে কখনো চোখে পড়েনি। প্রায় প্রতিটি মুখেই ব্যস্ততা ; পায়ের মাপ যদিও সকলের সমান নয়, গতিও এক একজনের এক একরকম। প্রতিটি মুখই আলাদা। হয়তো প্রত্যেকের ইতিহাসও আলাদা। এদের মধ্যে কেউ কি নেই, যে আমার মতো, নিঃসঙ্গ ; যে হাঁটছে, কিন্তু যার কোনো গন্তব্য নেই ! এমন কেউ

কি আছে যার বুকের মধ্যে সময় হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় ; প্রতিটি মুহূর্ত যার অনুভূতির মধ্যে ছড়িয়ে থাকে নুনের দানার মতো !

সম্ভবত একটু বেশি তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম আমি। কানের কাছে অতর্কিত কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়ালাম।

'কি, ভালো আছেন তো ?'

ফরসা দোহারা চেহারার এক যুবক আমার সামনে দাঁড়িয়ে। অল্প দূরত্বে একটি সরল-মুখ যুবতী, মাথায় ঘোমটা, সম্ভবত যুবকেরই স্ত্রী।

আমি খুব ভালো করে লক্ষ্য করলাম। কিন্তু চিনতে পারলাম না।

যুবকটি বোধহয় আমার মনোভাব আঁচ করতে পারলো। সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে বললো, 'চিনতে পারছেন না। আপনিই তো মিসেস চেধুরী—'

ছাঁৎ করে উঠলো বুকের মধ্যে। তবু হাসতে হলো। অস্ফুটে বললাম, 'হ্যাঁ—'

'আমি সুখেন্দু সরকার।' সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকালো যুবকটি, 'মনে পড়ছে না ! সেবার কাশ্মীর বেড়াতে গিয়ে আলাপ হলো—'

আমার কিছুই মনে পড়লো না। যুবকটি অপ্রস্তুতভাবে তাকালো তার স্ত্রীর দিকে। এই অবস্থায়, আমার মনে হলো, তাকে চেনাই উচিত। স্বাভাবিক হয়ে বললাম, 'ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে।'

প্রায় হাত ধরে তার স্ত্রীকে টেনে এনে আমার সামনে দাঁড় করালো সুখেন্দু।

'ইনি মহীতোষবাবুর স্ত্রী। তোমাকে এঁদের কথা—'

কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আমি বললাম, 'নতুন বিয়ে ?'

মেয়েটি চোখ নিচু করলো। শান্ত মুখ; টলটলে চোখে সুখ উপচে পড়ছে। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলাম মেয়েটিকে। আমাদের সম্পর্কে কী কথা বলেছে তোমার স্বামী ? মনে মনে বললাম, যা শুনেছো সব ভুলে যেও। সিঁদুর পরতে খুব ভালো লাগে বুঝি !

'মিস্টার চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়নি অনেক দিন।' সুখেন্দু বললো, 'একদিন আসবো। সেই বাড়িতেই আছেন তো?'

আমি এমনভাবে ঘাড় নাড়লাম যার অর্থ হ্যাঁ বা না দুটোই হতে পারে।

সুখেন্দু এরপর যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

'আচ্ছা, নমস্কার। মিস্টার চৌধরীকে বলবেন আমার কথা।'

ট্রাম লাইন পেরিয়ে উল্টো দিকে চলে গেল ওরা। তারপর উত্তরমুখো হাঁটতে শুরু করলো।

বোধ হয় একটু বেশিক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম আমি। আশপাশে দু' একজন লক্ষ্য করছে দেখে খেয়াল হল আমি দাঁড়িয়ে আছি একই জায়গায়, অনেকক্ষণ। এখন যে-কেউই আমাকে দেখে অন্য কিছু ভাবতে পারে।

কিন্তু হাঁটতে গিয়ে হাঁটুতে জোর পেলাম না কোনো। দূরে অপসৃয়মান দুটি মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ জ্বালা করে উঠলো আমার; পরিষ্কার আলোড়ন শুরু হলো বুকে। অনেক দিন পরে মহীতোষ আবার আমাকে নাড়িয়ে দিয়ে গেল।

আমি তোমার স্মৃতি আঁকড়ে থাকতে চাই না মহীতোষ। কেন তুমি আমার পিছু নিয়েছো!

রবিবার সকালে টিকলুকে নিয়ে এলো পরিতোষ। আমি অপেক্ষা করছিলাম। ট্যাক্সির শব্দ শুনে ছুটে গেলাম বাইরে।

পরিতোষ তখনো নামেনি। গাড়ির এককোণে চুপ করে বসেছিলো টিক্লু। আমাকে অধৈর্যভাবে হাত বাড়াতে দেখেই পরিতোষ ওকে এগিয়ে দিলো আমার দিকে।

'যাও টিকুলু, মার কাছে যাও।'

টিক্লু আমার দিকে তাকালো। থমথমে মুখ। তারপর পরিতোষকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কোথায় যাচ্ছো ?'

'আমি একটু ঘুরে আসছি।' পরিতোষ বললো, 'সকাল থেকে মার কাছে যাবো, মার কাছে যাবো করছিলি, এখন হঠাৎ চুপ করে গেলি কেন !'

আমি ওর হাত ধরে টানলাম, 'এসো, সোনা, মার কাছে আসবে না !'

টিক্লু বললো, 'আমি কাকার সঙ্গে যাবো।'

'আমি আসছি এখুনি—'

'না।'

'উফ্, ইন্‌টলারেবল !' পরিতোষ বিরক্ত হলো। 'বৌদি, তুমি দাঁড়িয়ে আছো কেন ! ওকে নিয়ে যাও আমি ঘুরে আসি একটু।'

এই বয়সে জ্ঞান হয়ে যায় পুরোপুরি। ধমকটা বোধহয় বুঝতে পারলো টিক্লু। আর কথা না বলে ছলছলে চোখে নেমে এলো গাড়ি থেকে। পরিতোষ চলে গেল।

আমি ওকে কোলে তুলে নিলাম। সিল্কের চুলগুলো এলোমেলো হয়ে পড়েছিলো, হাত দিয়ে সমান করে চুমু খেলাম, গলায় নাক ঘষে গন্ধ নিলাম গায়ের। যেন কতকাল পরে টিক্লুকে দেখছি, কতো কি যে করতে ইচ্ছে করছিলো আমার !

কিন্তু, এখন আমি কিছুই করবো না। এতোক্ষণ যা করেছি তাও কি বাড়াবাড়ি নয়! খানিক আগে পরিতোষের ধমক শুনে কাঠ হয়ে গিয়েছিলো শরীর, পাল্টা ধমক দিতে ইচ্ছে করছিলো পরিতোষকে। লজ্জায়, গ্লানিতে সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে এলাম আমি; কেমন ছোটো লাগলো নিজেকে। যেন আমি জেলখানার কয়েদী, সন্তানের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে—আর একটু পরেই সে চলে যাবে। পরিতোষকে ধমক দিয়ে আমি কি নিজের অধিকার খাটাতে চাইছিলাম! তাছাড়া পরিতোষকে দোষ দিয়ে লাভ কি! ওর রেগে ওঠার কারণও তো আমি জানি।

'মার কাছে আসতে তোমার ভালো লাগে না?' টিকলুকে জিজ্ঞেস করলাম। আপাতত এইটেই আমার কাছে সবচেয়ে জরুরী প্রশ্ন। করুণ চোখে তাকিয়ে থাকলাম ওর মুখের দিকে—সত্যি হোক, মিথ্যে হোক; টিকলু তুমি আমাকে হতাশ করো না।

টিকলু কি বুঝলো কে জানে, খানিক দুর্বোধ্য চোখে চেয়ে রইলো আমার দিকে। তারপর হঠাৎ গলা জড়িয়ে ধরে বললো, 'মা-মণি, তুমি কেমন আছো?'

'ভালো আছি। খুব ভালো আছি।' আবেগে গলা বুজে এলো আমার।

ঘরে এসে কোল থেকে নেমে পড়লো টিকলু। শোভার মাকে ডেকে বললাম, 'ওর জুতোটা খুলে দাও। পাখাটা এতো আস্তে চলছে কেন! জোর করে দাও।'

টিকলুর মুখ এখনো থমথমে। বিজবিজে ঘাম কপালে। সোফায় বসে শান্ত হয়ে জুতো খুলতে দিলো। ঘরের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে চোখ, পাখার হাওয়া লেগে চুলগুলো আবার নেমে এলো কপালে।

'এটা কাদের বাড়ি?'

'আমাদের। তোমার পছন্দ হচ্ছে না!' আমি বললাম, 'ওই ছাখো, ওটা কার ছবি বলো তো?'

সেলফ্-এর ওপর রাখা ওর ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ অপলকে তাকিয়ে থাকল টিকলু। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বললো, 'এটা আমাদের বাড়ি নয়।'

কী করে বোঝাবো বুঝতে পারলাম না। নতুন পরিবেশে বোধহয় মেনে নিতে পারছে না আমাকে। যদি অনেক দিন পরে কোনো অসম্ভব জায়গায় হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, টিক্লু কি চিনতে পারবে আমাকে! মাকে মা বলে চেনার জন্যে কোন চিহ্ন দরকার তোমার!

সোফা থেকে নেমে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো টিক্লু। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলো, 'কাকা কখন আসবে?'

'এইবার আসবে। টিক্লু, তুমি আমার দিকে তাকাও। ছাখো, তোমার জন্যে আমি কত কি এনেছি।'

হাত ধরে শোবার ঘরে নিয়ে এলাম ওকে। আসবে জেনে কালই আমি ওর জন্যে অনেক কিছু কিনে এনে রেখেছি। দম দেওয়া ট্যাঙ্ক, লুডো, ছড়াছবির বই, একটা ঘি রঙের বাবা-স্যুট্। খেলনাগুলো বিছানার ওপর রেখে বললাম, 'ছাখো, কতো কি! সব তোমার। এসো, আমরা ট্যাঙ্ক গাড়িটা চালাই।'

টিক্লু বললো, 'না। আমি বাড়ি যাবো।'

বুকের মধ্যে পাথর গড়ানোর অনুভূতিটা স্পষ্ট টের পেলাম আমি। এ-রকম হাত পা কামড়ানো অবস্থা জীবনে হয়নি। সোজাসুজি টিক্লুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার ছ'চোখ জলে ভরে এলো। টিক্লু, আমিই তোর ঘরবাড়ি, বলবার চেষ্টা করলাম, আমিই তোকে পেটে ধরেছিলাম, আমারই রক্ত বইছে তোর শরীরে! একদিন তোকে কাছে টানিনি, তা বলে কেন তুই এতো দূরে চলে যাবি! কোন শোধ তুই তুলছিস আমার ওপর!

সত্যি সত্যিই কান্না চাপতে পারলাম না আমি।

শোভার মা কখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্য করি নি। বললো, 'সবই কপাল মা! না হলে এ-রকম হবে কেন!'

তারপর টিকলুর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বললো 'নাও না খোকাবাবু, খেলনাগুলো নাও। মার আদর ঠেলতে নেই!'

কথাটা বিশ্রী লাগলো কানে। সচরাচর এমন হয় না। এর চেয়ে অনেক বড়ো দুঃখ তো আমি চুপচাপ মেনে নিয়েছি; বলতে কি, চোখের জল ব্যাপারটাই আমার কেমন খেলো লাগে। আজ হঠাৎ কেন এমন হলো বুঝতে পারলাম না! প্রত্যাখ্যান? মহীতোষের প্রত্যাখ্যান কি অনেক বেশী অসহনীয় ছিলো না!

'তুমি যাও, শোভার মা।' তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বললাম, 'বেলা হয়েছে ওর খাবারটা রেডি করো।'

শোভার মা চলে যেতে টিকলু আমার কাছে ঘেঁষে এলো।

'মা-মণি, তুমি আমাকে একটা বন্দুক কিনে দেবে?'

'দেবো।' হেসে বললাম আমি, 'তুমি আমার কাছে থাকবে?'

'হ্যাঁ, থাকবো।' ধুপ্ করে আমার কোলের উপর বসে পড়লো টিকলু। ছবির বইটা হাতে নিয়ে অল্প নাড়াচাড়া করলো। তারপর হঠাৎই বললো, 'পিসী বলেছে বিকেলে এসে নিয়ে যাবে। তুমি যাবে আমাদের বাড়িতে?'

'না, বাবা।' ওর নাক টিপে দিয়ে বললাম, 'এটাও তোমার বাড়ি। তুমি মা-মণির কাছে থেকে যাও না?'

ট্যাঙ্কটা তুলে নিয়ে টিকলু বললো, 'তুমি এটা চালিয়ে দাও।'

দম দিয়ে ট্যাঙ্কটা মেঝেয় ছেড়ে দিলাম আমি। ওটা শব্দ করে চলতে লাগলো।

টিকলুর কথাবার্তা এখনো কেমন এলোমেলো, কোথায় যেন একটা অপূর্ণতা থেকে গেছে। হাবাগোবা! কথাটা আজই আমার বেশি করে মনে হলো। ওর আরো একটু চনমনে, আরও একটু পাকা হওয়া উচিত ছিলো। লক্ষ্য করে দেখলাম ট্যাঙ্কটা হাতে তুলে নিয়ে চাকায় ফুঁ দিয়ে ঘোরাবার চেষ্টা করছে টিকলুর ঠোঁটের পাশে আল্‌গা হাসি। হাসিটা ওর মুখের বিষণ্ণতা ঢাকতে পারেনি।

কি হবে না হবে জানি না। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

কলিং বেলের শব্দে বুঝলাম পরিতোষ ফিরে এসেছে। উঠে গিয়ে দরজা খুললাম।

'কই, শ্রীমান কোথায় ?'

'খেলছে ঘরে।' আমি বললাম, 'এসে পর্যন্ত কাকা কাকা করে অস্থির। কী যে হয়েছে ছেলেটার!'

'এমন একটা কাকা পেলে তুমিও অস্থির হতে। নেহাতই দেওর বলে—'

'ফাজলামি রাখো।' বললাম, 'কোথায় গিয়েছিলে বলো তো ?'

এই যে এইটা, ফেলে এসেছিলাম। একেবারে বাড়ির দরজায় এসে মনে পড়লো। আবার ছুটতে হলো।'

পরিতোষের হাতে একটা ফাইল। আগে লক্ষ্য করিনি। আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই পরিতোষ বললো, 'তোমার শরীর খারাপ নাকি বৌদি ?'

ডাকটা কানে লাগলো। পরিতোষ বুঝতে না পেরে এমন ভাবে হেসে বললাম, 'দেখে তাই মনে হচ্ছে ?'

'হচ্ছে বলেই তো বললাম।' পরিতোষ চোখ নামিয়ে নিলো। ঘরের দিকে যেতে যেতে বললো, 'তোমার নতুন কেয়ারটেকারটি কোথায় ? একটু চা খেতাম—'

শোভার মা টিক্লুর সঙ্গে লুডো খেলছে। পরিতোষকে দেখে উঠতে যাচ্ছিলো। আমি বললাম, 'থাক, তুমি ওর কাছেই থাকো। টিক্লু, তুমি দুধটা খেয়েছো তো ?'

গুটি চালতে চালতে ঘাড় নাড়লো টিক্লু। খেলায় ওর মন বসে গেছে।

এখন আর ওর কাছে যাবো না, আমি ভাবলাম, পর ভাবার চেয়ে এই ভালো। আমি বুঝবো টিক্লু আছে। অনেকক্ষণ পরে আমি একটু হালকা বোধ করলাম।

পরিতোষ বললো, 'কেমন নেমকহারাম দেখেছো! একবার চোখ তুলে তাকালো না পর্যন্ত!'

'ওকে দোষ দিয়ে লাভ কি! ওটা তোমাদের বংশের দোষ!'

'বৌদি, প্লীজ!' পরিতোষ হাত জোড় করলো, 'আমাকে আর এর মধ্যে জড়িও না। তোমাকে বলিনি, যা হয়েছে, হয়েছে, এবার ভুলে যাও—'

কথাটা এড়িয়ে গেলাম আমি। বললাম, 'বসো চা করে আনছি।'

স্নায়ু জুড়ে আবার সেই প্রচ্ছন্ন বিষাদ। হঠাৎ পরিতোষের সামনে এভাবে কথাটা বলা ঠিক হলো না। হয়তো পরিতোষের কথাই ঠিক, ফেরার পথ যখন বন্ধ, আমার পক্ষে ভুলে যাওয়াই শ্রেয়। অতীত জড়িয়ে যাচ্ছে বর্তমানের সঙ্গে, ভুলে যাওয়া কি সত্যিই সহজ! তাহলে তোমাকেও ভুলে যেতে হয়, পরিতোষ, ভুলে যেতে হয়, টিক্‌লুকে। মজার ব্যাপার, আজই খানিক আগে, পরিতোষের গলায় বৌদি ডাক শুনে কেমন বেসুরো লেগেছিলো কানে, আজই টিক্‌লুকে কাছে টানতে না পেরে প্রথম চোখের জল ফেলতে হলো আমাকে। অতীতটাকে ভুলতে গিয়ে আমি কি আরো বেশি করে জড়িয়ে পড়ছি অতীতে! হয়তো তাই। না হলে যে-মহীতোষের সঙ্গে আজ আর আমার কোনো সম্পর্ক নেই, মনীশের শরীরে লিপ্ত হয়ে—বিদ্যুতের শিকড়ের মতো ওর শরীরের প্রচণ্ড উত্তাপ যখন ছড়িয়ে পড়ছে আমার দেহে ও রক্তে, সেই মুহূর্তেও মহীতোষের দীর্ঘ অপ্রত্যাশিত মুখ কেন আমি ভুলতে পারিনি!

মাঝে মাঝে মনে হয়, একা আমি নই, অনেকগুলো আমি কাজ করে যাচ্ছে আমার মধ্যে—হিংস্র, বিক্ষুব্ধ, কাতর অনেকগুলো আমি। এরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের শত্রু। প্রত্যেকেই ছাড়িয়ে যেতে চাইছে প্রত্যেককে। কেউ। কেউ ছুটছে অতীতের দিকে, কেউ বর্তমানে, কেউ ভবিষ্যতে। আমি কোনদিকে যাবো!

ফাইল খুলে কাগজপত্র ঘাঁটছিলো পরিতোষ, আমাকে দেখে অপ্রস্তুত হলো। চায়ের কাপটা হাত থেকে নিতে নিতে বললো, দেখে ফেললে তো!'

'ওগুলো কি ?' আমি বললাম, 'অফিসটাকে বাড়িতে টেনে এনেছো মনে হচ্ছে ?'

'তাহলে তো ফায়দা হতো , কিছু ওভারটাইম পেতাম।' চায়ে চুমুক দিয়ে নড়েচড়ে বসলো পরিতোষ। 'দেখে ফেলে ভালোই করেছো। না হলে দেখাবার জন্যে একটা অজুহাত খুঁজতে হতো—'

'ব্যাপারটা কি !' ফাইলটা ওর হাত থেকে টেনে নিলাম আমি। তাড়াহুড়োয় কয়েকটা কাগজ ছড়িয়ে পড়লো মেঝেয়। ঝুঁকে তুলে নিলাম। চেনা লাগলো চোখে। দু'একলাইন পড়ে বললাম, 'এগুলো তোমার দাদার জিনিস। এখানে এনেছো কেন !'

'বাই অর্ডার।' সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করলো পরিতোষ। 'এই শেয়ারগুলো তোমার নামে কেনা হয়েছিলো। তুমি সই না করলে তো ট্রান্সফার করা যাবে না—'

'এই !' আমি বললাম, 'কলমটা দাও। এরজন্যে লজ্জা পাচ্ছিলে কেন ! বাধ্য ভাইয়ের মতোই কাজ করেছো। কি ভেবেছিলে, সই করবো না !'

বোধহয় আমি আর একটা ভুল করলাম। পরিতোষের মুখের আকস্মিক পরিবর্তন দেখেই তা বুঝতে পারলাম।

'কিছু মনে করো না। ভেবে বলিনি কিছু।'

'তুমিও যেমন!' পরিতোষ একটা সিগারেট ধরালো। নার্ভাস হলেই ও এটা করে। এক ঢোক ধোঁয়া গিলে বললো, 'আমার অসুবিধে কি জানো, আমি প্রতিবাদ করতে পারি না। বাধ্য হওয়ার অনেক অসুবিধে। এই জন্যেই কিছু হলো না !'

ভিতরের ঘর থেকে টিকলুর গলা পাচ্ছি। হাসছে। মনে হলো শোভার মার সঙ্গে রীতিমতো জমে গেছে ও। খানিক উৎকর্ণ হয়ে ওর গলার স্বর শুনলাম আমি। বোধহয় মহীতোষের সঙ্গে লেনদেনের এইটুকুই বাকি ছিলো। টিক্‌লু আছে ; ওকে কি ভাগ করা যাবে !

বুকের মধ্যে ছুটির ঘণ্টা বাজছে। এতোক্ষণ আমরা অনেক কথা

বলেছি। আর ভালো লাগছে না। একা হতে হতে এখন মাঝে মাঝে একাকিত্ব মন্দ লাগে না।

ক্লান্তিতে হাই উঠলো আমার। পরিতোষকে বললাম, 'টিকলুকে তোমার মতো করে মানুষ করো, পরিতোষ! ও যেন আমাদের মতো না হয়!'

জবাব না দিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো পরিতোষ।

ব্যর্থতার ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ক্রমশ। শো-কেসের বাইরে থেকে ভিতরের বস্তু দেখে প্রলুব্ধ হবার মতো—এ আমি কী করছি! একে কি পাওয়া বলে! বা, অধিকার! খেলনা পরিবৃত হয়ে টিকলু এখন দিব্যি ভুলে রয়েছে নিজেকে, এই বাড়িটাকে এখন আর তার অন্যরকম লাগছে না। অথচ এই সামান্য বিশ্বাসটুকু অর্জন করার জন্যে খানিক আগে পর্যন্ত মাথা খুঁড়েছি আমি! তখনই কি বোঝা উচিত ছিলো না সব কিছুর মতো আরো একটি অর্থহীনতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমি, ওকে জড়াতে গিয়ে নিজেই জড়িয়ে পড়ছি ক্রমশ, টিকলুর জন্মের পর পাঁচটা বছর কেটে গেল—সাবলীল পাঁচটি বছর; দীর্ঘ দূরত্ব থেকে এখনো কী করে আমি দাবী করে যাচ্ছি, টিকলু, আমাকে দ্যাখো, তুমি আমার সন্তান আমারই রক্ত তোমার শরীরে, আমিই তোমার জন্মদাত্রী—তোমার সবকিছুর ওপর এই আমার দাবী!

আবার ফিরে এলো নৈঃশব্দ্য। বৃষ্টির আগে ক্রমশ কালো হয়ে আসে আকাশে, দারুণ মেঘের ছায়া ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত। শিরার ভিতর রক্তের হামাগুড়ি দিয়ে চলাফেরার মতো নৈঃশব্দ্যের সঞ্চরণ অনুভব করলাম আমি। আগুন জ্বেলে দেবার পর জ্বলতে থাকে নিজের নিয়মে —জন্মদাত্রী বলে সে কী রেহাই দেবে আমাকে! টিকলুর কথা, হাসি, উচ্ছলতার শব্দ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এলো আমার কানে।

পরিতোষ চলে যাবার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলাম আমি। বেলা বাড়তে টিকলুকে চান করালাম, খাওয়ালাম। নতুন বাবা-স্যুট পরে হাসি মুখে আমার দিকে তাকালো ও। অবিকল

আমার মুখ, বিশেষ তারতম্য নেই আদলে। ছোটবেলার ছবিটা হারিয়ে ফেলেছি, না হলে মিলিয়ে দেখা যেতো।

কিন্তু, এখন আর কোনো আবেগ আচ্ছন্ন করলো না আমাকে। ভগ্ন সেতুর এপার থেকে আমি নাড়াচাড়া করলাম ওকে। সময় চলে যাচ্ছে।

পরিতোষ বলে গেছে বিকেল নাগাদ টিক্‌লুকে নিতে আসবে শীলা। সময় চলে যাচ্ছে দ্রুত। যাক। ঘুমে ঢলে পড়ার আগে টিক্‌লু আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'মা মণি, তুমি আমাকে একটা বন্দুক কিনে দেবে তো?' আমি বললাম, 'দেবো বাবা, ঠিক দেবো। দেখো দেবো।'

প্রায় একই সঙ্গে হাই উঠলো দু'জনের। তুই ও কি আমার মতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিস টিক্‌লু! আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম আমি। এতো কাছে, তবু কতো দূর! শো-কেসের বাইরে থেকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিরুপায় অস্বস্তি ছড়াতে লাগলো আমার মধ্যে। মুঠোয় জল ভরে রাখার মতো একটা খেলায় মেতেছিলাম এতোক্ষণ। এখন প্রার্থনা করলাম, আরো একটু দ্রুত কেটে যাক সময়। বরং আমি একা হবো।

রোদ পড়ে যাবার পর শীলা এলো। সময় কেটে যায়।

শীলার চোখে কৌতূহল। গোটা ফ্ল্যাটটা ঘুরে ফিরে দেখলো, স্প্রিংয়ের খাটের ওপর গড়িয়ে নিলো একবার, যেন অনেকদিন ধরে ও সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো।

'তুমি তো ভালোই আছো, বৌদি। বেশ গুছিয়ে বসেছো!'

'আমার কথা থাক।' অল্প হাসতে হলো আমাকে, 'তোমাদের খবর বলো। মা কেমন আছেন?'

'ভালো নেই। কী করে থাকবে বলো!' শীলা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলো 'টিক্‌লু, তুমি যাবে তো?'

'বসো। চা খেয়ে যাও।' আমি বললাম,'অতো তাড়ার কি আছে!'

'আর একদিন আসবো, বৌদি। দাদা অপেক্ষা করছে বাইরে। টিক্‌লুকে নাকি বেড়াতে নিয়ে যাবে।'

'তাহলে তো যেতেই হবে—'

আমি উঠলাম। শোভার মা টিক্‌লুর খেলনাগুলো গুছিয়ে দিচ্ছে। ওকে পাহারা দিচ্ছে টিক্‌লু। শীলাকে একবার বুড়ি-ছোঁয়া করেই চলে এসেছে এখানে—আপাতত ফেরার জন্যে তাড়া নেই কোনো ; দুপুর থেকে একবারও বাড়ি যাবার কথা বলেনি। এখন আমিই ওকে পাঠাবো।

জুতো পরিয়ে চুল আঁচড়ে দিতে দিতে বললাম, 'পিসীর সঙ্গে যাও এখন। বাবা এসেছে, তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে।'

'তুমি যাবে না ?'

টিক্‌লুর চোখে শুধুই প্রশ্ন। উত্তরটা এক্ষুনি জেনে নিতে চায়।

'আমি আর একদিন যাবো।'

'না, তুমি যাবে—'

টিক্‌লু আমার আঁচল চেপে ধরলো। ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'আচ্ছা, তুমি এখন পিসীর কাছে যাও। আমি আসছি—'

টিক্‌লু হেঁটে গেল। বোধহয় শীলার কাছকোছি পৌঁছে গেল। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা অনুভব করলাম আমি।

হঠাৎ কেমন গরম লাগতে শুরু করেছিলো। বুকে আবার সেই পাথর গড়ানো অনুভূতি—কান গরম হয়ে উঠলো, নিঃশ্বাস পড়ছে থেমে থেমে। পাখার রেগুলেটারটা শেষ পর্যন্ত ঘুরিয়ে দিয়ে বিছানায় এসে বসলাম। বাইরে মোটরের হর্নের শব্দ। মহীতোষ হয়তো গাড়িটা বিক্রী করে দেবে—পরিতোষ বলেছিলো, বেচে দেওয়াই ভালো। বড্ড রেকলেস ড্রাইভ করছে আজকাল, সেদিন সিরিয়াস অ্যাক্সিডেন্ট হতো—বলতে বলতে চুপ করে গিয়েছিলো পরিতোষ। হয়তো মহীতোষ সম্পর্কে আমার কোনো উৎসাহ নেই ভেবে। অথচ এটাই ঠিক, আমি শুনছিলাম কান খাড়া করে। হয়তো মুখের ভাবটা ফোটেনি ঠিকমতো।

'বৌদি, আমরা আসছি—'

শীলা তাড়া দিলো। আমি উঠলাম। আঁচলে মুখ মুছে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এলাম। টিক্‌লুকে দেখছি না। আমার দৃষ্টি লক্ষ্য করে শীলা বললো, 'ও দাদার কাছে গেল।'

খোলা দরজাটার দিকে ক'মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলাম আমি। ভালোই হলো ; শেষের মুহূর্তটিকে আমি যে-কোনোভাবে কল্পনা করে নিতে পারবো। মনে মনে বললাম, দুষ্টুমি করো না, ভালো থেকো। এর বেশি আর কোন কথা বলতাম !

'টিক্‌লু একটা বন্দুক চেয়েছিলো—' ব্যাগ থেকে টাকা বের করে শীলার দিকে বাড়িয়ে ধরলাম, 'এটা রাখো। কিনে দিও।'

শীলা হাত গুটিয়ে নিলো। ভুরু তুললো অল্প।

'টাকা দিচ্ছো কেন, বৌদি ? আমরাও তো কিনে দিতে পারি !'

'তোমরা তো সবই দিচ্ছো, এটা আমাকে দিতে দাও মুখ ফুটে চেয়েছিলো। আমার কাছে কবে আর কি চাইবে !'

'তোমার কথার মানে বুঝি না !' ঝট করে আমার হাত থেকে টাকাটা টেনে নিলো শীলা। 'ছেলেকে ছেলে বলে ভেবো, তাহলে আর এসব মনে হবে না চল—'

বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। এখান থেকে গাড়ির অর্ধেকটা দেখা যায়, বাকিটা আড়াল পড়েছে দেয়ালে। শীলা উঠে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে। এইবার আমি ফিরবো—হঠাৎ টিক্‌লুর গলার কান্না শুনলাম। ব্যাপারটা বুঝলাম না কিছু। চেঁচিয়ে কিছু একটা বলছে। কী, তা এতোদূর থেকে বোধগম্য হয় না।

মাথার মধ্যে দপ করে কিছু একটা জ্বলে উঠলো। আস্তে আস্তে, ক্রমশ দ্রুত, লনের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম আমি। স্বপ্নাবিষ্টের মতো।

ততোক্ষণে শীলা নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে। টিক্‌লুও। আমাকে দেখেই সম্ভবত শীলার হাত ছাড়িয়ে এদিকে ছুটে এলো টিক্‌লু, আমার আঁচল চেপে ধরলো।

'মা মণি, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে—'

'টিক্লু, অমন করে না।'

'না তুমি যাবে।'

শীলা এগিয়ে এলো তাড়াতাড়ি। চোখ তুলে মহীতোষকে দেখলাম আমি। অপ্রস্তুত ; যেন এ-ঘটনার জন্যে সে আদৌ প্রস্তুত ছিলো না।

'মা-মণি, তুমি এসো—এসো না—'

আমি অবাঞ্ছিত, এখন আমি তোমার কেউ নই। এসব তুমি কবে বুঝবে! হাত পা অসাড় হয়ে এলো আমার। মুখে বললাম, 'টিক্লু, শোনো একটা কথা—পিসী তোমাকে বন্দুক কিনে দেবে—'

'না, তুমি এসো।'

অসহায় ভাবে শীলার দিকে তাকালাম আমি। শীলা বললো, 'ছেলেটা এতো জ্বালায়! চল, বাড়ি চল, শিগগিরি—'

শীলা ওর হাত ধরে টানলো। টিক্লু চেঁচিয়ে উঠলো ; আতঙ্কের ছায়া ওর মুখে। আমি কেঁপে উঠলাম। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে শোভার মা, দোতলা থেকে আমার পিঠে ছুরির মতো লেগে আছে মিস্টার লাহিড়ীর চোখ ; এরই মধ্যে রাস্তায় দু'একজন দাঁড়াতে শুরু করেছে। যা করার এখুনি করতে হবে। তীব্র অসহায়তার মধ্যে টের পেলাম বিশাল ও দুর্বোধ্য এক শক্তি ক্রিয়াশীল হয়ে উঠছে আমার ভিতরে। টিক্লুর একটা হাত ধরে আছে আমাকে, এই স্পর্শ আমি চিনি—এখন আমি যা ইচ্ছা করতে পারি।

'ওকে শুধু শুধু বকছো কেন!' শীলাকে বললাম।

'তোমাদের ব্যাপার তোমরা বোঝো। যা সীন ক্রিয়েট করলে—'

শীলা চলে যাচ্ছিলো। দেখলাম মহীতোষ এগিয়ে আসছে। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ও আমার সামনে দাঁড়ালো, পরিষ্কার চোখ ফেললো আমার চোখে। ধুয়ে দেওয়ার মতো করে ও আমার ভিতর পর্যন্ত ছুঁয়ে দেখলো যেন। অসহ্য লাগছিলো! আমি চোখ নামিয়ে নিলাম।

'তুমিও আমাদের সঙ্গে এসো। আমি নামিয়ে দিয়ে যাবো।' অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলা মহীতোষের। টিক্‌লুর হাত ধরে বললো, 'এসো। মা আসছে—'

কি করলাম জানি না। সম্ভবত আমি নিজের মধ্যে ছিলাম না, সম্ভবত মহীতোষের এই কথাগুলির জন্যেই দীর্ঘ সময় জুড়ে অপেক্ষা করছিলাম আমি। একটা খাপছাড়া দুঃখবোধ মূক করে রাখলো আমাকে। যখন খেয়াল হলো, দেখলাম, ঠিক যেমন থাকা উচিত— আমার ও মহীতোষের মাঝখানে শান্ত হয়ে বসে আছে টিক্‌লু, শীলা পিছনে; গাড়িটা এগিয়ে চলেছে নিঃশব্দে।

হয়তো এই আমার নিয়তি; অবশ্য নিয়তি বলে যদি কিছু থেকে থাকে। বাস্তব জড়িয়ে যাচ্ছে স্বপ্নের সঙ্গে। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে কোথাও একটা ছেদবিন্দু নিশ্চয় আছে, আমি তাকে ধরতে পারছি না। প্রতিবাদহীন শুধু এগিয়ে চলেছি সেই শূন্যতার দিকে, যেখানে থেকে ফেরবার জন্যেই প্রতিদিনের প্রতিটি মুহূর্তের কাছে নতজানু হয়েছি আমি।

কেউ কোনো কথা বলছি না। এইরকম নৈঃশব্দ্য নিয়ে শববাহকেরা হাঁটে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করালো মহীতোষ। বিচ্ছিন্নভাবে নামলাম আমরা। সেখান থেকে মাঠে।

টিক্‌লু বললো, 'মা-মণি, আমাকে একটা বল দাও না! আমি খেলবো—'

নতুন বিপত্তি। আমার অস্বস্তি দেখে শীলা বললো, 'এখানে বল কোথায় পাবো? তুমি কি বলটা এনেছো?'

মহীতোষ খানিকটা এগিয়ে গেছে। মাঠ বলেই সম্ভবত হালকা রোদ্দুর আলো ফুটিয়ে রেখেছে চারিদিকে। হু হু করে ছুটে আসছে হাওয়া। একই সঙ্গে আমরা গাছের নিচে দাঁড়ালাম।

অনেকদিন পরে টিক্‌লুকে সজীব দেখছি আমি। বিকেলের রোদ্দুর

ও হাওয়া দুরন্ত উৎসাহ ছড়িয়ে দিয়েছে ওর মুখে। খানিক এদিক ওদিক তাকিয়ে বললো, 'তাহলে এখন আমি কী করবো ?'

মহীতোষ বললো, 'দৌড়ও। দেখি তুমি কতোদূর দৌড়তে পারো—'

'আমি অনেকদূর দৌড়তে পারি। দেখবে ?'

টিকলু ছুটলো। মহীতোষ সিগারেট ধরালো। শীলা আর আমি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। কিছুদূর দৌড়ে আবার ফিরে এলো টিকলু।

'আরো দূরে দৌড়বো ? বাবা, তুমি ওয়ান টু, থ্রী বলো—'

'ওয়ান, টু—'

থ্রী পর্যন্ত অপেক্ষা করলো না টিকলু। আবার ছুটছে।

শীলাকে বললাম, 'আমি একটু বসি এখানে—'

'তোমার ক্লান্তি লাগছে, বৌদি ?'

'না, এমনিই—'

কথা শেষ হলো না। ছুটতে ছুটতে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়েছে টিকলু। মহীতোষ এগিয়ে যাচ্ছিলো, তার আগেই শীলা দৌড়ে গেল।

আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। না, তেমন কিছু নয়। টিকলু উঠে পড়েছে। এখন শীলার সঙ্গে পাল্টা দৌড়ে মাতলো।

সময় চলে যাচ্ছে। আর একটু পরেই সন্ধ্যে হবে। আমি ফিরে যাবো। মহীতোষ বলেছে নামিয়ে দিয়ে যাবে। বাড়ি পর্যন্ত ওদের টেনে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছি না। বরং ভালো হতো যদি এই মুহূর্তে টিকলুর অনুপস্থিতির সুযোগে চলে যেতাম আমি। কিন্তু, হঠাৎ খেয়াল হলো আমার, প্রায় অচেতন অবস্থায় যেমন-তেমন করে চলে এসেছি তখন, সঙ্গে একটিও পয়সা নেই যে ট্যাক্সিতে কিংবা ট্রামে বাসে যাবো। এখন আমি সত্যিই ভিখিরি। কী করবো ? হাঁটবো ?

বোধহয় আমি একটু বেশি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। চোখ তুলতেই দেখলাম মহীতোষ তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

'তোমার বোধহয় খুব অসুবিধে হলো!' দূরত্ব থেকে বললো মহীতোষ। নিরুত্তাপ, আত্মজিজ্ঞাসার মতো কণ্ঠস্বর।

জবাব না দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি। কী এলোমেলো হয়ে দূরত্বের কথা ভাবছি! মহীতোষ কি সত্যিই আমার সুবিধে অসুবিধের কথা ভেবে জিজ্ঞেস করলো! কী বলবো আমি এখন!

সেই মুহূর্তের নীরবতা গভীর ভাবের মতো চেপে বসলো আমার বুকে। স্পষ্ট অনুভব করলাম, অসংখ্য শব্দের সৃষ্টি হচ্ছে আমার মনে, হয়ে যাচ্ছে, তীব্র বাঙ্ময় সব কথা! মহীতোষ, তুমি কি আর একটু কাছে আসবে, মনে মনে বললাম, এই দূরত্ব আমি সহ্য করতে পারছি না। অথচ এখনই আমার অনেক কথা জানতে ইচ্ছে করছে। তোমার পিঠে মাঝে মাঝে যে-ব্যথাটা হতো সেটা কি সেরে গেছে? কেন অমন বেপরোয়া হয়ে গাড়ি চালাও তুমি? নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারো না, কতো রোগা হয়ে গেছো! আমাকে বাদ দিয়ে তুমি কি সুখী হয়েছো মহীতোষ?

মহীতোষ অন্যমনস্ক, আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে। আরো দূরে টিক্‌লু ও শীলা—সবুজ ঘাসের ওপর ছুটোছুটি করছে পরিচ্ছন্ন ছবির মতো। সূর্যের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ানোর জন্যেই সম্ভবত মহীতোষের দীর্ঘ ছায়া পড়েছে মাঠের ওপর। হঠাৎ হাওয়ায় একটা শুকনো পাতা উড়ে গেল।

ওরা যতোক্ষণ না ফিরবে, অন্তত ততোক্ষণ আমার কিছু করার নেই। আমি ওর ছায়াটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

নয়

সকাল আটটা থেকে দুপুরের শেষ পর্যন্ত ঘুরলাম হফ্‌মানস্তাল দম্পতির সঙ্গে। আজকের দিনটা ছিলো বেশ; প্রায় সারাক্ষণ মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে আছে আকাশ, সেই সঙ্গে আল্‌গা, এলোমেলো হাওয়া। এই আবহাওয়ায় ক্লান্তি আসে না সহজে। অবসাদ বলতে যা-কিছু তার বেশিটাই মানসিক।

আমার পক্ষে বরং এই ভালো। মোটামুটি দায়িত্ব নিয়ে একটা কিছু করলাম—যে-কোনো কাজ, এই ভাবনাই ওপর ওপর চালিয়ে নিয়ে গেল আমাকে। এখন দেখলে যে-কেউই আমাকে সুখী ভাবতে পারে। বুকের ভিতর কে আর খুঁড়তে যাচ্ছে! এ ক'দিনে একটি ব্যাপার অন্তত বুঝেছি, অবসাদ আর ক্লিন্নতার—নিঃসঙ্গতার—যে-অনুভূতি এতোদিন কর্মব্যস্ততা দিয়ে ঢেকে রাখার একটা উপলক্ষ্য খুঁজছিলাম মনে মনে, উপলক্ষ্যটা ধরা দিলেও, তার রেশ যায়নি। আমার মন থাকলো আমার হয়ে; হয়তো একটু শান্ত, কিন্তু ডাকলেই ছুটে আসে সমস্ত পুরনো অনুষঙ্গ নিয়ে।

তবু, এই ভালো। কাজটা আমার ভালো লাগছে। এখন ঘুম থেকে উঠি ঘড়ির কাঁটা ধরে। তারপর অধিকাংশ মানুষই যেভাবে নিয়মানুবর্তিতার অংশ হয়ে ওঠে, তেমনি, প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি অফিসে। কাজ আর তেমন কী! গত সাতদিনের মধ্যে আজই প্রথম একটু নড়াচড়ার সুযোগ পেলাম—ডাচ্‌ দম্পতিকে নিয়ে ঘুরলাম নানা জায়গায়। কিছুক্ষণ নৌকোয় ভেসে বেড়ানো, তারপর বেলুড় আর দক্ষিণেশ্বর হয়ে ফিরে আসা। গোড়ার দিকে একটু সঙ্কোচ ছিলো, আর ভয়; মিস্টার সরকারের সুপারিশে চাকরি তো হলো, শেষ পর্যন্ত রাখতে পারবো তো! এখন দেখছি ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়; কাজের মধ্যে শুধু সুস্মিত হয়ে থাকা

আর সারাক্ষণ সৌজন্যে ভরে রাখা নিজেকে। সত্যি বলতে, চাকরির ব্যাপারে আজই প্রথম নিজের ওপর কিছুটা আস্থা দেখা দিলো। হোটেলে ফিরতে ফিরতে বিদেশী দম্পতি যখন ভারতীয় মেয়েদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন, বুঝলাম আমাকে দিয়েই বিচার করছেন ওঁরা—এমন একজনকে দিয়ে, যে শুধু নিজেরই প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, যার সঙ্গে আর কারুরই কিছু মেলে না।

হফ্‌মানস্তাল দম্পতিকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে বিদায় চাইলাম আমি। ওঁরা তাতে রাজী নন। বিশেষত মহিলাটি। 'এসো, চা খেয়ে যাও,' স্যুইটে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি হলো না।

এড়াতে পারলাম না। এই একটি বিষয়ে আমি বরাবরই অশক্ত; প্রতিবাদ ও আপত্তি কখনোই জোর করে উঠে আসে না মন থেকে। নিজের ওপর আমার কোনো জোর নেই, অধিকার নেই, কতোবার যে এইসব ভাবি।

হফ্‌মানস্তালেরা নিঃসন্তান। আমস্টারডামের কাছে আছে তাঁদের বিরাট ডেয়ারী আর ফার্ম, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই দেখাশোনা করেন। দু' বছর অন্তর বেরোন বিদেশ ভ্রমণে। এবার এসেছিলেন ইণ্ডিয়ায়; দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজ ঘুরে অবশেষে কলকাতায়। কিছু আতঙ্ক ছিলো, কলকাতা সম্পর্কে এক ধরনের ভীতি; আপাতত ভালোয় ভালোয় সফর শেষ হওয়ায় খুশি। এইসব নিয়েই কথা হচ্ছিলো; মনে পড়লো বেলুড় যাবার রাস্তায় মিস্টার হফ্‌মানস্তাল হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলেন, কলকাতা নিয়ে এতো যে অশান্তির কথা শুনি তার কারণ কী! জুতসই কোনো জবাব দিতে পারিনি আমি; কৌশলে প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই ছিলো বেশি।

কিই বা বলতাম! হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় অনেকরকম শব্দ; সুড়ঙ্গের অন্ধকার পার হওয়ার মতো, শুনতে পাই, নিঃশব্দে কান্না যেন বেঁচে থাকার নতুন উদ্দেশ্য খুঁজতে বেরিয়েছে। টুকরো কথা ছড়িয়ে পড়ে অফিসে, রেস্তোরাঁয়, ট্রামে আর বাসে। এসব নিয়ে আমার

কোনো মাথাব্যথা নেই। বিচ্ছিন্ন হতে হতে আজ আমি এমন জায়গায় এসে পৌঁচেছি, যেখানে কৌতূহল বলতে কিছু নেই, থাকলেও তার স্বাদ পেতে হয় জোর করে। কতোকাল যে খবরের কাগজের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বলতে পারবো না! মাঝে মাঝে ভাবি, স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ যেদিকে যায়—যে-সব সম্পর্ক ও বিষয় নিয়ে গড়ে ওঠে তার কৌতূহল আর আকর্ষণ, আমার চলা ঠিক তার বিপরীত দিকে। যে-কোনো খবরেই তাই আমি চমকে উঠি, কোনো খবরই তাই আমার কাছে আর বিস্ময় নিয়ে আসে না। এমন কি প্রত্যেক শব্দের ভিতর লুকিয়ে থাকে যে বিশেষ অর্থ আজকাল মাঝে মাঝে তাও ভুলে যাই আমি। বলতে বলতে কেমন এলোমেলো হয়ে পড়ে কথাগুলো, ছড়িয়ে জড়িয়ে একাকার হয়ে যায়, বুকের ভিতর এক রকম অসহায়তা নিয়ে থেমে পড়ি হঠাৎ। যেমন সেদিন, ফোনে কথা বলছিলাম পরিতোষের সঙ্গে, হঠাৎ বিভ্রান্তি এসে ছেঁকে ধরলো আমাকে—বলার কথাগুলো হারিয়ে গেল হঠাৎ! বোধহয় ভুল করছি একটু। কথাগুলো থাকলো, মাঝখান থেকে আড়ষ্ট হয়ে এলো জিভ। ফোন ছাড়ার আগে পরিতোষ বললো, কী ব্যাপার বলো তো, তুমি যেন একটু একটু তোতলাচ্ছো! শব্দ করে হাসলাম আমি, কিছু নয়, ও কিছু নয়।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। পিঠের ওপর মিসেস হফ্‌মানস্তালের হাতের স্পর্শে খেয়াল হলো।

'এটা তোমার।' ভাঙা ভাঙা ইংরিজীতে বললেন, 'সামান্য উপহার—'

আপত্তিতে কাজ হলো না। ওঁদের দেশে তৈরি দামী স্কার্ফ্‌টা গুঁজে দিলেন হাতে। শেষ পর্যন্ত না করলান না। হয়তো আরো একটু আপত্তি জানানো উচিত ছিলো আমার, সেই মুহূর্তের অন্যমনস্কতা থেকে কিছুতেই বের করে আনতে পারলাম না নিজেকে।

মিস্টার হফ্‌মানস্তাল তার ঠিকানা ছাপা কার্ড দিলেন আমাকে, আমার ঠিকানা নিলেন। বললেন, কখনো ওঁদের দেশে গেলে যেন আগেভাগেই জানাই, ওঁরাই আমার সব দায়িত্ব নেবেন।

এ সবই সৌজন্য, আমি বুঝি, সাধারণ বুদ্ধিতে আমার অভিভূত হওয়ার কথা। সে-রকম কিছু হলো না। চলে আসছি, মিসেস হফ্‌মানস্তাল বললেন, 'বিয়ে করলে খবর দিও।'

আমি একটু দাঁড়ালাম। অল্প হেসে বললাম, 'দেবো।'

তারপর নেমে এলাম নিচে।

প্রতারণাটুকু উপভোগ করতে ভালো লাগছে। জানি, আর কোনো-দিন ওঁদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর একটু পরেই ওঁরা দমদমে গিয়ে প্লেন ধরবেন। এখান থেকে দিল্লী; পরশু বা তার পরের দিন পৌঁছে যাবেন নিজেদের দেশে। আমি পড়ে থাকবো আমার মধ্যে। হয়তো কালই আবার হফ্‌মানস্তাল দম্পতির মতো আর কারুর সংস্পর্শে আসবো; হয়তো তার পরের দিন গড়ে উঠবে এমনিতরো আরো একটি সম্পর্ক। দ্রষ্টব্য স্থানে ভ্রমণের মতো আমাকেও ছুঁয়ে যাবে তাদের বিভিন্ন ধারণা। চারিদিক জুড়ে ট্যুরিস্টদের আসা যাওয়া—শুধু আমিই থাকবো অবিচল, একা।

নিজেকে নিয়ে ভাবনার সবটাই কি দুঃখের! হয়তো নয়। যেমন, এখন, হফ্‌মানস্তাল দম্পতির মনে নিজের সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা সৃষ্টি করতে পেরেছি ভেবে খুশিই হলাম আমি। এক্ষুনি একবার আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে হলো; উপায় থাকলে দেখতাম ছ' বছরের বিবাহিত জীবন আর সন্তানের মা হওয়া কি সত্যিই কোনো ছাপ রেখে যায়নি আমার ওপর! সত্যিই কি এখনো আমাকে পবিত্র কুমারী বলে ভুল হয়!

হয়তো এটাই সত্যি, যে যার নিজের মতো করে তাকায় লক্ষ্যবস্তুর দিকে, নিজের গ্রহণ ক্ষমতা দিয়ে বিচার করে নেয় তার ভালোমন্দ। অনেকটা যেন টর্চের আলো, যখন যেখানে পড়ছে মাত্র সেই জায়গাটুকুই আলাদা হয়ে আসছে অন্ধকার থেকে।

এঁরা তো তবু অনেক দূরের, আজকের পরিচয় আজকেই শেষ হয়ে গেল। খুব কাছের থেকে যারা আমাকে দেখছে, গত কয়েক বছরের

বিভিন্ন ঘটনার অনেকটাই যারা জানে, তারাও কি পারে শেষ পর্যন্ত সবকিছু জানতে, বুঝতে, হৃদয়ঙ্গম করতে! সম্ভবত পারে না।

সোমা পারেনি। গত একটি মাসের মধ্যে অন্তত বার তিনেক দেখা হলো তার সঙ্গে—একদিন দুপুরে খেতে ডেকেছিলো আমাকে, মনীশ ছিলো না, সন্ধ্যের শোয়ে আমরা মেট্রোয় সোফিয়া লোরেনের ছবি দেখলাম একসঙ্গে। এতোটা সান্নিধ্যে থেকেও সোমা কি বুঝতে পেরেছে তার স্বামী, মনীশ, আর আমার মধ্যে সম্পর্কটা কী রকমের! সোমা কি জানে, আমাদের কথার মাঝখানে ক্লাবে যাবে বলে হঠাৎ যে মনীশ বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে—এমন কি যাবার সময় তাকিয়ে পর্যন্ত দেখে না আমাকে, আসলে সে ফিরে আসে আমারই কাছে! তারপর শুরু হয় তার সোমায় অতৃপ্ত এক ভীষণ যুদ্ধ।

এও একরকমের প্রতারণা—নিজের সঙ্গে নিজের, প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্তে আমি যার দায় বয়ে বেড়াচ্ছি। মনে হচ্ছে এইভাবেই চলতে হবে আমাকে। এক রাত্রির আকস্মিক প্রয়োজন আমাকে ঠেলে দিলো কী গভীর অবিমৃষ্যকারিতার মধ্যে! ইচ্ছে থাক, না থাক, আমাকে মেটাতে হবে মনীশের প্রয়োজন, সাড়া দিতে হবে তার ভালোবাসা-হীন শরীরের খেলায়! কোথায় গেল আমার সেই জেদ আর অহঙ্কার, মহীতোষের সন্দেহ থেকে, মহীতোষের আক্রোশ থেকে যা একদিন আমাকে বের করে এনেছিলো! জীবনের ছ'টি বছর যার ভালোমন্দ সুখ অসুখের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছিলাম নিজেকে, সে-ই বা আজ কোথায়!

হোটেল থেকে এতোটা রাস্তা চলে এলাম হাঁটতে হাঁটতে, একবারের জন্যেও খেয়াল হয়নি এই পায়ে-হাঁটা অপ্রয়োজনীয়, বা পড়ন্ত হলেও সূর্যের তাপ যায়নি। তাছাড়া এখন আমি একটা কিছু করছি—কিছু দায়িত্ব রয়েছে আমার, সময়ও একান্তভাবে আমার ইচ্ছাধীন নয়। না, তা নয়। কিন্তু ভাবনাগুলো যে আমার, সময় ও দায়িত্ব দিয়ে ইচ্ছে থাকলেও তাদের বেঁধে রাখার সাধ্য নেই! তারা চলছে

অদ্ভুত ও স্বাবলীল এক নিজস্ব নিয়মে। টানছে, ছিঁড়ছে; কিন্তু তেমন কিছু দিচ্ছে না যার নাম স্থিতি, যা পেলে আমি কিছুটা স্বস্তি পেতাম।

অফিসে ফিরলাম প্রায় শেষ বেলায়। সহকর্মীদের মধ্যে যাদের বাইরের ডিউটি ছিলো তারা ততোক্ষণে ফিরে এসেছে। কাউণ্টারের ওদিকে বসে আপেল চিবোচ্ছিলো মাধুরী। আমাকে দেখে বললো, 'ফিরলেন তাহলে! দেরি দেখে আমরা ভাবছিলুম হয়তো হল্যাণ্ডেই চলে গেলেন—'

বললাম, 'কেন! খুব কি দেরি করেছি!'

'না, দেরি আর কি!' সমীরণ বললো, 'আটটা থেকে পাঁচটা, জেট হলে প্রায় হল্যাণ্ডেই পৌঁছে যাওয়া যেতো।'

'সে ভয় নেই।' অমল টিপ্পনী কাটলো, 'ডাচ্‌রা এমনিতেই কঞ্জুস, অতো সহজে সঙ্গে নেবে না।'

আঁচলে কপাল মুছে চেষ্টা করে হাসলাম আমি। ব্যাগ থেকে বের করে স্কার্ফটা দেখালাম। 'কঞ্জুস, কিন্তু আমার লাভই হয়েছে—'

মাধুরী ছুটে এসে স্কার্ফটা ছিনিয়ে নিলো হাত থেকে, 'ওঃ, লাভ্‌লী! নিশ্চয়ই বুড়োটা দিয়েছে!'

'না, বুড়ীটা।'

'যেই দিক,' অমল বললো, 'জিনিসটা কস্টলী। আপনার স্টার্ট কিন্তু ভালোই হলো মিসেস চৌধুরী!'

মাধুরী স্কার্ফটা ভাঁজ করে রাখছিলো; বললাম, 'নেবে তুমি?'

'না, না পরে কিছু পেলে দেবেন—'

আমি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। সেই সময় বেয়ারা এসে বললো, 'সাহেবের ঘরে আপনার ফোন আছে।'

সাহেব অর্থে মিস্টার রঙ্গনাথন। বিশেষ 'কল' না হলে ওখানে যাবার দরকার পড়ে না। সব ক'টা চোখের দৃষ্টি এসে পড়লো আমার মুখের ওপর। জয়েন করার দিন থেকেই এই দৃষ্টিগুলো আমি অনুভব করতে পারছি। বিব্রতভাবে এগিয়ে গেলাম আস্তে আস্তে।

ফোনে কথা বলছিলেন কারও সঙ্গে ; 'ইয়েস, সী ইজ হেয়ার,' বলতে বলতে রিসিভারটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন মিস্টার রঙ্গনাথন, 'মিস্টার সরকার অন্ দ্য লাইন—'

শুনে স্বস্তি হলো। সন্দিগ্ধ হওয়াটা সম্ভবত আজকাল আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। তার ওপর রঙ্গনাথন আমার বস্, অস্বস্তি সেই-জন্যেই বেশি। ভাবলাম যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কথা শেষ করবো।

দু' চারটে সাধারণ কথাবার্তার পর মিস্টার সরকার বললেন, 'তুমি সুব্রতকে চেনো তো ?'

'সুব্রত !'

'সুব্রত মিত্র। একদিন তো তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—'

'গুড্।' একটু থেমে বললেন, 'আমাদেরই একটা প্রোডাক্ট—ট্যালকম পাউডার—বিজ্ঞাপনের জন্যে মডেল খোঁজা হচ্ছে। তুমি রাজী থাকলে ওরা তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।'

আমি ইতস্তত করছি দেখে মিস্টার সরকার বললেন, 'ঝামেলা কিছু নেই। বিসাইডস্, ইট্স্ পেয়িং।'

কথার ধরণেই বুঝতে পারছি মিস্টার সরকারেরও প্রোক্ষ ইচ্ছে আছে ব্যাপারটাতে। তা ছাড়া, আমার আপত্তি করবারই বা তেমন কী কারণ থাকতে পারে !

বললাম, 'ঠিক আছে।'

'তাহলে সুব্রতকে বলছি তোমায় কন্ট্যাক্ট করতে। ও. কে ?'

'আচ্ছা—'

ফোন ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে এলাম তাড়াতাড়ি।

বাইরে এসে খট্‌কা লাগলো একটু, ব্যাপারটা কি অভদ্রতা হলো ! ঠিক বুঝতে পারছি না, মিস্টার রঙ্গনাথনের সঙ্গে হয়তো দু'একটা কথা বলা উচিত ছিলো। আর কিছু না হোক, আজকের অভিজ্ঞতার কথা

অন্তত বলতে পারতাম তাঁকে ; হয়তো খুশি হতেন মিস্টার রঙ্গনাথন। এখন আর ফিরে যাওয়ার, নতুন করে আলাপ শুরু করার, উপায় নেই —সেটা অশোভন হবে।

নিজের প্রতি ধিক্কারে আকস্মিকভাবে ভরে উঠলো মন। যে করেই হোক, এই চাকরিটা আমাকে বাঁচাতে হবে।

দশ

'এটা কি আটাত্তরের-এক-বী ?'

'হ্যাঁ।'

'মানসী আছে ?'

কিশোরটি আমার দিকে তাকালো। গভীর টলটলে চোখ, একটু বা মেয়েলি ধরণের। এ-রকম চোখে সন্দেহ খেলে না ; স্বাভাবিকের একটু এদিক ওদিক হলেই ফুটে ওঠে বিস্ময়। এখনো তাই ফুটলো।

দরজা থেকে হাত দুটো নামিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী বলবো ?'

আমি নাম বললাম। কিশোরটি বললো, 'আপনি ভেতরে এসে বসুন। আমি দিদিকে ডেকে দিচ্ছি।'

কিশোরটি চলে যেতে আমি ভিতরে এলাম।

সাত আট বছরে কিছু অদলবদল হয়তো হয়েছে এখানে, তাহলেও এসব আমার চেনা দৃশ্য। নিজের সাত আট বছরের পুরনো অতীতটাকে খুঁটে খুঁটে তুলে আনতে পারি ; আমার পক্ষে এগুলো ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। তা হলেও, আমি চিনতে পারিনি।

আমি কি নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছি ! মেরুদণ্ড আলগা করে ভাবতে বসলে মনে হয় স্মৃতি সঙ্কুচিত হয়ে আসছে ক্রমশ, ঘেয়ো কুকুরের মতো নিজের ছায়াটুকু ছাড়া আর সবই হারিয়ে ফেলছি আমি। কমে আসছে মনে রাখার মতো জায়গা। যেটুকু এখনো আছে, ছোটো হতে হতে তা পরিণত হবে বিন্দুতে—একদিন তা হবেই। মনে হয় তার আর খুব বেশি দেরি নেই। হয়তো একেই বলে মৃত্যু। প্রতিদিনই একটু একটু করে মরছি ; বাকি থাকলো সম্পূর্ণতা। কবে তার নাগাল পাবো !

এই রাস্তা ধরে অনেক দিন যাতায়াত করেছি আমি, তবু চিনতে পারিনি রাস্তাটা। শেষ পর্যন্ত ট্যাক্সিঅলার বুদ্ধির ওপর নির্ভর করতে হলো। আটাত্তরের-এক-বী'র সামনে দাঁড়িয়ে সন্দেহ হয়েছিলো

আমায়, মানসী ঠিকানাটা ভুল দেয়নি তো! হঠাৎ দেখে মানসীকেও কি চিনতে পেরেছিলাম! না, পারিনি।

মানসীর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো সিনেমা হাউসের বাইরে। ইভনিং-শো ভাঙার পর একা আমি বেরিয়ে আসছিলাম তাড়াতাড়ি, হঠাৎ কাঁধের ওপর হাত পড়লো

'নমি না!'

আমি ঘুরে তাকালাম।

মানসী বললো, 'আমাকে চিনতে পারছিস না! আমি মানসী!'

তক্ষুণি মনে পড়ে গেল। না চেনার কোনো কারণ নেই। লজ্জা সামলে বললাম, 'আরে! কী কাণ্ড! কী করে চিনবো বল, চেহারা একদম বদলে গেছে—'

'তুই কিন্তু একটুও বদলাসনি!'

আমরা ভিড় থেকে সরে এসে দাঁড়ালাম। আলগা হাওয়ায় আমার কপালের ঘাম শুকিয়ে এলো।

মানসী বললো, 'হলে ঢোকার সময়েই তোকে দেখেছিলাম আমি। ইণ্টারভ্যালে ভাবলাম ডাকবো—জায়গাটা গুলিয়ে গেল। কতোদিন পরে দেখা হলো বল তো! পাঁচ বছর?'

মনে করতে পারলাম না। সে-সব ভাবার উৎসাহও নেই।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে দেখলো মানসী।

'বিয়ে হলো, ছেলেপুলে হয়ে গেল—চেহারাটা তবু কুড়িতেই আটকে রেখেছিস!'

জবাব দিলাম না। পৃথিবীশুদ্ধ লোক এসে বললেও বিশ্বাস করবো না আমি একটুও বদলাইনি! নিজের চোখ ছাড়া আর কারুর চোখকে এখন আমি বিশ্বাস করি না। মানসীর সঙ্গে দেখা হলো অনেকদিন পরে ও হঠাৎ, ওকে সে-কথা বলা যাবে না।

গলা পাল্টে জিজ্ঞেস করলো মানসী, 'যা শুনেছি তা কি সত্যি?'

'কী শুনেছিস ?'

'তোরা নাকি—'

'হ্যাঁ, আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে।' কর্ক-স্ক্রু লাগিয়ে মানসী আমাকে তুলে নিলো। এটা আমার নিজের বিষয়। বাড়ির পুকুরে চান করার মতো, এখন আর কোনো অসুবিধে হচ্ছে না—কথাগুলো আসতে লাগলো সাবলীল হয়ে। বললাম, 'মহীতোষের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নেই। এখন আমি আলাদা থাকি।'

'কোথায় ?'

আমি বলতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই মানসী জিজ্ঞেস করলো, 'তোর কি এখন খুব ফেরার তাড়া ? একটু হাঁটবি ?'

'হ্যাঁ, চল।'

আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। নিঃশব্দে।

কথা ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত ; ওজন কমে আসছে শব্দের। অথচ সম্পর্ক রাখতে হলে নির্ভর করতে হবে শব্দের ওপর, কথার ওপর, স্তব্ধতাকে আমার ভীষণ ভয়। মানসীর সঙ্গে চুপচাপ হাঁটতে হাঁটতে ভয়টা ঢুকে পড়লো বুকের মধ্যে। মানসী কিছু না বলা পর্যন্ত চুপ করে থাকতে হবে আমাকে। আমার কিছুই বলার নেই। আমি চাইছি মানসী কিছু বলুক, যা-হোক কিছু, এমন ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা নিয়ে বেশিক্ষণ হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়।

মানসী এতো চুপচাপ কেন ! আগের কথাগুলোর জন্যে দুঃখিত ! না কি ভাবছে, যা বলেছে, বলা উচিত হয়নি !

'তোর ছেলে ?' হঠাৎ মনে পড়ার মতো করে বললো মানসী, 'কী যেন নামটা ?'

'টিক্লু।'

'এখন নিশ্চয় অনেক বড়ো হয়ে গেছে !'

'বছর পাঁচেক। শাশুড়ীর কাছে থাকে। আমি একটা ফ্ল্যাট নিয়েছি। এখন একটা পার্টটাইম কাজ করছি, গাইডের—'

একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে ফেললাম আমি; নিজের সম্পর্কে যা যা বলার, সমস্ত।

আমরা হাঁটতে লাগলাম। নিঃশব্দে।

হয়তো ঠিক বলা হলো না। আর একটি শব্দও এখন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি আমি। ব্যর্থতার। হৃৎপিণ্ডটা মাঝে মাঝে উঠে আসে গলা পর্যন্ত; আটকে পড়া নিঃশ্বাসের শব্দ ওঠে অব্যক্ত। বুকের মধ্যে কে যেন বলে ওঠে, অপেক্ষা করো, অপেক্ষা করো। কিসের অপেক্ষা, কার জন্যে, অপেক্ষার শেষে কী পাবো বা নতুন করে কিছু হারাবো কি না, কিছুই বুঝতে পারি না। সান্ত্বনা এইটুকু, নতুন করে হারাবার মতো আর কিছুই নেই আমার।

মানসী ঘরে ঢুকে বললো, 'ওমা! তুই!'

'কেন! তোর ভাই নাম বলেনি!'

'বলেছিলো। তবে তুই যে সত্যি সত্যিই আসবি ভাবতে পারিনি। কতোক্ষণ এসেছিস? আমি কি খুব দেরি করলাম!'

আমার পক্ষে এ-কথার জবাব দেওয়া সহজ নয়। বড্ড দেরি করেছে বা আর একটু তাড়াতাড়ি আসা উচিত ছিলো মানসীর, এ-রকম কোনো কথাই এতোক্ষণ ভাবিনি।

আমি বসেছিলাম তক্তপোষের ওপর। মানসী আমার পাশে এসে বসলো।

'তুই কি এখুনি ফিরলি?'

'না। আজ ক্লাস ফাঁকি দিয়ে দুপুরেই চলে এসেছি। একটু বাজারে বেরিয়েছিলাম। কাল একাদশী, মা আবার এসব ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে। চান করে ভাবছিলাম খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়বো।'

ঘুমের কথায় হাই ওঠে। আমি বললাম, 'রাত করে এসে তোদের অসুবিধে করলাম না তো!'

'ফর্মালিটি রাখ।' মানসী বললো, 'তোর কানের দুলটা তো বেশ! লেটেস্ট ডিজাইন মনে হচ্ছে—'

মানসী আমার কানে হাত দিয়ে ঢুল দেখতে লাগলো।

'তোর সঙ্গে একটা জরুরী দরকার ছিলো—'

'জরুরী দরকার!' চেরা চোখে তাকালো মানসী, 'ঠাট্টা-ফাট্টা করছিস না তো!'

আমি বললাম, 'না, ঠাট্টা নয়। ঠাট্টা-ফাট্টা ভুলে গেছি। আমার দরকারটা খুবই জরুরী, না হলে বুঝতেই পারছিস, এতোদিন পরে—'

কথা শেষ হলো না। সেই কিশোরটি, মানসীর ভাই, ঘরে ঢুকলো। কেমন ছটফটে ভাব। আমাদের দিকে এক পলক তাকিয়ে চলে যাচ্ছিলো দরজার দিকে, মানসী ডাকলো।

ছেলেটি ঘুরে দাঁড়ালো, 'কিছু বলছো?'

'এতো রাত্রে কোথায় বেরুচ্ছিস আবার?'

'কোথাও না।' আড়চোখে আমাকে দেখে নিলো ছেলেটি, 'একটু আসছি মোড় থেকে।'

'না, তুমি এখন বেরুবে না।' উঠে দাঁড়িয়ে মানসী বললো, 'নিশ্চয়ই জটলা করতে যাচ্ছিস! খানিক আগেও বোমার শব্দ শুনেছি। তুই এখন বেরুবি না—'

'বোমা তো যখন-তখন ফাটছে।' ক্ষুণ্ণ গলায় বললো ছেলেটি, 'আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবো। সন্দেহ হলে ঘড়ি ধরে থাকো—'

'তুই যে কী হয়েছিস, চন্দন!' মানসী অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো, 'এই সেদিন পুলিসের হাতে মার খেয়ে এলি। এবার একদিন ধরা পড়বি, আর ছাড়বে না। তোর কি ধারণা দাদা বারবার তোকে ছাড়িয়ে আনবে!'

'আমি কি ছাড়িয়ে আনতে বলেছিলাম! আজেবাজে কথা বলছো কেন!'

সমস্ত কথাবার্তাই কেমন রহস্যময়। নেপথ্যে কিছু একটা ঘটে গেছে এটুকু বোঝা যায়। কি, আমার পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। ছেলেটির মুখের দিকে তাকালাম আমি। সেই মেয়েদের মতো টলটলে

চোখ, দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে বেপরোয়া ভাব, এই মুহূর্তে দেখলে মনে হয় ভিতরে ভিতরে নিজের সঙ্গে একটা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। মানসীর চেয়ে রাস্তার টান অনেক বেশি, আমি না থাকলে হয়তো অনেক আগেই ছুটে বেরিয়ে যেতো। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

মানসী বোধহয় ব্যাপারটা লক্ষ করেছিলো। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে বললো, 'নমিতাকে তুই চিনতে পারছিস না, চন্দন ?'

'অনেক আগেই চিনতে পেরেছি।' সোজাসুজি আমার দিকে তাকালো চন্দন। 'দরজা খুলে আপনাকে দেখেই চেনা লেগেছিলো। নামটা বলতে মনে পড়ে গেল।'

আমার এতোক্ষণে মনে পড়লো। সেইসব দিন এখন কোথায়! বললাম, 'চিনবে না কেন! তুমি তো অনেকদিন আমাদের বাড়ি গেছো। তখন অনেক ছোটো ছিলে, দেখতেও বোধহয় অন্যরকম ছিলে!'

চন্দন বোধহয় লজ্জা পেলো : ঠোঁট কোঁচকালো অল্প। ছোটো বয়সটাকে এখন আর ও স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। দরজাটা খোলা ছিলো। মুখ ঘুরিয়ে ও রাস্তা দেখতে লাগলো।

মানসী বললো, 'এখন একেবারে লায়েক হয়ে গেছে। ওর কাজকর্ম শুনলে তোর মাথা ঘুরে যাবে।'

চন্দন কিছু বললো না। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে মানসীর কথাবার্তায় ও বেশ বিরক্ত। বয়স আর একটু বেশি হলে ওর মুখের কঠিন ভাবটা ধরা পড়তো।

'ঠিক আছে, যা। পনেরো মিনিটের ভেতর ফিরে আসবি।'

চন্দন বেরিয়ে গেল।

আবার গোড়া থেকে শুরু করবো কি না ভাবলাম—মানসী, তোর সঙ্গে খুব জরুরী দরকার ছিলো। কিন্তু, না, এখন আর সোজাসুজি বলা যাবে না। মানসী অন্যমনস্ক। চন্দন চলে যাবার পর দরজার কাছে

গিয়ে দাঁড়ালো। রাস্তা দেখলো। ফিরে এসে বললো, 'তোর ঘড়িতে এখন ক'টা বাজে রে?'

'প্রায় ন'টা। মিনিট পাঁচেক বাকি আছে।'

'কী যে করছে এরা!' মানসীর মুখে ছায়া ছড়ালো; 'তুই আসবার সময় কিছু দেখলি না রাস্তায়?'

'কি!'

'পুলিস-টুলিস—গণ্ডগোল—'

আমি ঘাড় নাড়লাম। দেখিনি।

মানসী বললো, 'চল, আমরা ভেতরে যাই।'

'তোর মা কোথায়?'

'তখন তো পুজোর ঘরে দেখলাম।' মানসী আমাকে শুধরে দিলো, 'আগে মাসীমা বলতিস!' বললো, 'তুই অনেক বদলে গেছিস, নমি!'

সত্যিই বদলে গেছি আমি—বদলেছি ভয়ঙ্করভাবে; আঠাশে পৌঁছেও আমার চেহারা আটকে আছে কুড়িতে, কিন্তু মনে মনে পৌঁছে গেছি আটচল্লিশে।

আমাকে ঘরে বসিয়ে চা আনতে গিয়েছিলো মানসী। চা নিয়ে এলে চটপট।

একটা জরুরী কথা বলতে এসেছিলাম, বলা যাচ্ছে না। এখন চলে যেতে পারলেই সবচেয়ে ভালো হতো।

'রাত হলো! আমি এবার উঠি। তার ওপর—', বললাম 'পাড়াটাও তো ভালো নয় শুনছি—'

'বোস। মা আসছে এখুনি।' কাপ থেকে ঠোঁট তুললো মানসী, 'কী যেন দরকার বলছিলি?'

এইভাবে হঠাৎ কথাটা উঠবে ভাবিনি। মানসীর চোখ আমার কপালের ওপর। আর দেরি করা উচিত নয়, যা বলার এক্ষুনি বলে ফেলা দরকার।

'মানসী, তুই আমার একটা উপকার কর—'

'উপকার !' একটু খটকা লাগলো যেন মানসীর, 'কী বল তো ?'

'তোদের স্কুলে আমার একটা চাকরি হয় না ? তুই করে দিতে পারবি না ?'

'কী বলছিস যা তা !' মানসী বললো, 'তুই স্কুল মাস্টারী করবি কেন ! তা ছাড়া একটা কাজ তো—'

'মানসী !' ওকে থামিয়ে দিলাম, 'কথা বাড়াস না। আমি কেন চাইছি তুই বুঝবি না। এখানে আমার একদম ভালো লাগছে না। আমি পালিয়ে যেতে চাই—'

থমথমে মুখে আমার দিকে তাকালো মানসী।

'তোর কথা কিছু বুঝতে পারছি না !'

আর কী ভাবে বোঝানো যেতে পারে ! চারিদিকে জলের মধ্যে একখণ্ড দ্বীপের মতো ভেসে আছি, ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে পড়ছে অবিরত—যে-কোনো মুহূর্তে তলিয়ে যাবো। সেটাও ভীষণ রকম অনিশ্চত। মানসী, তুই কি বুঝবি, কেন আমি ছুটে এসেছি তোর কাছে, কেন চাইছি পালিয়ে যেতে !

নিজেকে সংযত করে বললাম, 'মনের অবস্থা তোকে বোঝাতে পারবো না, মানসী। দেখিস, যদি কিছু করা যায়—'

মানসীর মা এসে পড়লেন। ঝুঁকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম।

'মানুর কাছে তোমার কথা শুনেছি।' উদার চোখে আমাকে দেখলেন মানসীর মা। 'এই বয়সে ভগবান তোমাকে এতো বড়ো দুঃখ দিলেন কেন ! তোমার মুখে তো কোনো পাপের চিহ্ন নেই !'

পাপ কথাটা শুনলাম অনেকদিন পরে। পাপ কী, সে-সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। যা ঘটে গেল তা কি পাপের জন্যে, না কি অন্য কোনো কারণে ! তলিয়ে দেখিনি কোনোদিন।

তবু, ভদ্রমহিলাকে একটা জবাব দেওয়া দরকার।

'কিছুই জানি না, মাসীমা।' পবিত্র মুখে বললাম, 'কী যে হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না !'

'ভেঙে পড়ো না। ঠাকুর আছেন, তিনিই দেখবেন তোমাকে। আহা, এমন যেন কারুর না হয়!'

আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলো মানসী। বললো, 'তোর কথাটা মনে রাখবো। কিন্তু এতেই কী তোর প্রবলেম্ সল্‌ভ্ হবে!'

'দেখি—'

'সাবধানে যাস।'

রাস্তায় নেমে এলাম! ঋতুর কষ্টকর দিনগুলি কাটিয়ে আত্মস্থ চান করার মতো ঝরঝরে লাগলো; এতোক্ষণ উঁচু পর্দায় বেঁধে রাখা স্নায়ুগুলো ক্রমশ খুলে খুলে আসছে। মানসীর কাছে আসা কি খুব জরুরী ছিলো? হয়তো নয়। তবু, মাঝে মাঝে অপ্রয়োজনীয়ই হয়ে ওঠে জরুরী, চেষ্টা সত্ত্বেও তার সংস্রব এড়ানো যায় না।

প্রায় জনবিরল রাস্তা। দোকানপাট বন্ধ, রাস্তার আলো হঠাৎ কেমন কমে গেছে। পর পর দু'দিকের কয়েকটা ল্যাম্পোস্টে আলো নেই। এখন অনেক দূর পর্যন্ত তাকিয়েও কাউকে দেখা গেল না। হেডলাইট জ্বেলে একটা গাড়ি এগিয়ে আসছিলো দ্রুত, হাত বাড়িয়ে চোখ আড়াল করলাম আমি—পেরিয়ে যাবার সময় বুঝলাম পুলিস ভ্যান। দূরে পর পর প্রচণ্ড শব্দে বোমাই ফাটলো বোধহয়। পিছনে তাকিয়ে দেখলাম পুলিসের গাড়িটা অনেক দূরে চলে গেছে।

বোধহয় খুব অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। আকস্মিক গলার শব্দে চোখ তুলে দেখলাম বাঁদিকের অন্ধকার গলি থেকে চার পাঁচজন বেরিয়ে আসছে। মুখগুলি অস্পষ্ট, দেখে মনে হয় যুবক। ভয় হলো, আক্রান্ত হবো না তো! ওরা কাছাকাছি আসবার আগেই জোরে পা চালালাম আমি। এটা মধ্য পথ, পিছনে যাবার উপায় নেই। সুতরাং সামনেই যেতে হবে।

'নমিতাদি—'

একটু দ্রুতই হাঁটছিলাম। হঠাৎ চেনা গলা শুনে পিছনে তাকিয়ে দেখি চন্দন ছুটে আসছে। দাঁড়িয়ে পড়লাম।

'তুমি!'

'আপনাকে দেখেই এলাম। এতোক্ষণ ছিলেন বাড়িতে?'

'তোমার মার সঙ্গে কথা বলছিলাম, দেরি হয়ে গেল।' আমি ওর চোখের দিকে তাকালাম। চাঁদের আলোয় আরো টলটলে হয়ে উঠেছে চোখদুটো। বললাম, 'তুমি কি করছো! তোমার না তাড়াতাড়ি ফেরার কথা ছিলো!'

সে-কথার জবাব না দিয়ে চন্দন হাসলো। মানসী বলেছিলো এবার ও পার্ট টু দেবে।

'আপনি বাড়ি ফিরবেন তো? চলুন আপনাকে এগিয়ে দিই। রাস্তায় লোকজন চলছে না—'

'যাবে!' একটু ইতস্তত করলাম আমি। তারপর বললাম, 'বেশ চলো। আমারও একটু ভয় ভয় করছিলো।'

'এমনিতে ভয়ের কিছু নেই। এটা আমাদের পাড়া, গুণ্ডা বদমায়েস নেই। তবে—', অল্প থেমে চন্দন বললো, 'আজ শুনছি দশটার পর কার্ফু করে দেবে।'

'কেন!'

'কেন বলতে পারি না। ওই দিকে আজ একটা মার্ডার হয়েছে।' দূর দক্ষিণে আঙুল তুলে দেখালো চন্দন, 'পুলিস পিকেটের ওপর বম্ চার্জ করা হয়েছে। কার্ফু, রেড্, এখন অনেক কিছুই হবে।'

খুব সহজভাবে কথাগুলো বলে গেল চন্দন। যেন তেমন কিছু নয় ব্যাপারটা। বয়সের তুলনায় ওর কণ্ঠস্বর একটু ভারী।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার সঙ্গে যারা ছিলো তারা কোথায় গেল?'

'জানি না।' কথাটা সংক্ষেপে সারলো চন্দন।

আমি ওর ভিতরে উত্তেজনা লক্ষ করলাম। মনে হলো, এই মুহূর্তে হঠাৎ আমার সঙ্গ ধরে চলে আসার মধ্যেও ওর গভীর কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে।

'পুলিসের ওপর বোমা মারলে পুলিসও পাল্টা মার দেবে।' স্তব্ধতা ভাঙার জন্যে কিছু না ভেবেই বললাম আমি, 'পুলিস কি মানুষ নয়!'

চট করে কোনো জবাব দিলো না চন্দন। চুপচাপ হাঁটতে হাঁটতে বললো, 'হিটলার মানুষ ছিলো না!'

কথাটার মানে বুঝলাম না। পাল্টা জবাবের অপেক্ষা করলো না চন্দন। চাপা, ক্ষুব্ধ গলায় বললো, 'পুলিসও মানুষ, ঠিক কথা। ওদের হয়তো পুরোপুরি দোষ দেওয়া যায় না। দোষ আমাদের সমাজ ব্যবস্থার—যেখানে একটা ক্লাশ আর একটা ক্লাশকে ক্রমাগত শুষে যাচ্ছে। পুলিস সেই শোষণের মেশিনারি, বুর্জোয়া সিস্টেমের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র—'

চন্দনের গলা আবেগে চঞ্চল। কথাগুলো কিছু নতুন নয়; আমার দেওর পরিতোষও মাঝে মাঝে এই ভাষায় কথা বলে।

তবু চন্দনকে উপেক্ষা করতে ইচ্ছে করলো না। মুখের দিকে না তাকিয়েও আমি ওর টলটলে চোখদুটো দেখতে পাচ্ছি; অভিমান ছাড়া ওই চোখে কিছুই ফোটে না, ফুটতে পারে না। পুলিস ওকে মেরেছিলো কেন? পুলিস কি মানুষের চোখের দিকে তাকায় না!

'তুমিও কি বোমা ছুঁড়েছিলে, চন্দন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাকে হঠাৎ মারলো কেন! কোথায় মেরেছিলো? তোমার খুব লাগেনি তো?'

শব্দ করে হেসে উঠলো চন্দন। তারপর হঠাৎই পিঠের ওপর থেকে জামাটা তুলে আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালো।

'দেখুন। দেখতে পাচ্ছেন কিছু? এখন অবশ্য শুকিয়ে এসেছে—'

চাঁদের আলো পড়েছে চন্দনের বাদামী পিঠের ওপর—ম্যাপে দেখা পাহাড়ের মতো নীল এবড়ো খেবড়ো কয়েকটা ক্ষতের দাগ চোখে পড়লো। এমন হবার কথা নয়, তবু আমার হাতটা চলে গেল ওর পিঠের ওপর। অন্ধকার, জনশূন্য রাস্তা, আশেপাশে কেউ নেই;

কাঁচা মাংসের স্পর্শে আমার আঙুলের ডগাগুলো ঠাণ্ডা হয়ে এলো। ইস্! অস্ফুট উচ্চারণ সামলাতে পারলাম না আমি।

'মারের জন্য আমি ভাবি না। ইন ফ্যাক্ট, যখন মেরেছিলো, আমার কিছুই মনে হয়নি। কিন্তু, এখন মাঝে মাঝে চিনচিন করে ওঠে জায়গাটা। খুব অপমান লাগে। দাদা কেন আমাকে ছাড়িয়ে আনলো, মুচ্‌লেকা দিলো—এ সবের কী দরকার ছিলো! আমি কি একটা কাওয়ার্ড! কী ভাবছে সবাই আমার সম্পর্কে, মারের চোটে আমি সব ভুলে গেছি! আমি এখন কন্‌ফিডেন্স খুঁজছি—আমি আবার অ্যারেস্ট হতে চাই—'

চন্দন চুপ করে গেল। হঠাৎ।

আমি চুপ করে থাকলাম। মনে মনে বললাম, চন্দন, তুমি ফিরে যাও। এসব কেন বলছো আমাকে! কনফিডেন্স খুঁজছো, আমি তোমাকে তা দিতে পারি না। বরং যদি সঙ্গ চাও—আমারও খুব প্রয়োজন—দিতে পারি। তুমি কি আসবে চন্দন! কেমন অসঙ্কোচে পিঠের দাগগুলো আমাকে দেখাতে পারলে তুমি! উপায় থাকলে আমিও দেখাতাম—দ্যাখো,আমার বুকে এখনো সুস্পষ্ট দাঁতের দাগ; এক রক্ত থেকে অন্য রক্তে ক্রমাগত চালান হয়ে যাচ্ছি, প্রতিরোধহীন—জনস্রোতের উল্টোদিকে। আমাকে কে আশ্রয় দেবে!

'নমিতাদি, আপনি এবার চলে যান। একটা ট্যাক্সি-ফ্যাক্সি ধরে নেবেন। অসুবিধে হবে না তো?'

'না, আমি ঠিক চলে যেতে পারবো।' টলটলে দুটো চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তুমি সোজা বাড়ি ফিরে যেও। আর যদি পারো একদিন আমার বাড়িতে এসো। মানসীর কাছে ঠিকানা আছে—'

চন্দন হাসলো। তারপর পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলো। অন্ধকারে ঢুকে যাবার পরও ওর পিঠটা আমার চোখে লেগে থাকলো অনেকক্ষণ। শিরশির করে উঠলো আঙুলের ডগা। তারপর আর দেখতে পেলাম না।

এগারো

এইভাবে চলে যায় দিন, বেতো ঘোড়ার মতো টিকুতে টিকুতে। সময় কাটানো সম্পর্কে বিষদভাবে কিছু ভাবতে গেলে দিশেহারা হতে হয়। আবার মাঝে মাঝে সময়ের স্বতঃশ্চল প্রবাহে নিজেই অবাক হয়ে যাই—তাহলে সতি সত্যিই কেটে গেল এতোগুলো দিন! যেন একটা বিরাট উপন্যাসের মাঝামাঝি কোনো পরিচ্ছেদে এসে পড়েছি, যার শুরুর কথাটি 'দিন কাটিতেছে।' তার মানে কোথাও-না-পৌঁছুনো এক গভীর অনিশ্চিতি। কিংবা, গল্পের সেই বুড়োর মতো, পৃথিবীর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে যে শুধু আর এক দিনই বাঁচতে চায়, প্রতিদিনই প্রার্থনা করে মাত্র পরের দিনটির জন্যে—হয়তো নতুন ও অভাবিত কিছু ঘটবে এই আশায়।

আমি কি সে-রকম কিছু ভাবি!

নিজের কাছে এর একটিই উত্তর, না। যে-কোনো আশা, আকাঙ্ক্ষার জন্যেই থাকে নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত, বিভিন্ন ভাবনার স্রোতকে যা একই লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়, তারপর শুরু হয় তার বিশুদ্ধ ভ্রমণ। 'আমার কি সে-রকম কিছু আছে, যাকে বলা যায় পরিপ্রেক্ষিত, বা উৎস—বাসনা বা ইচ্ছে যেখান থেকে ছুটবে স্থির লক্ষ্যের দিকে!

ভিতরে তাকালেই বুঝতে পারি কেমন বদলে গেছি। পুরনো সম্পর্কগুলো আর তেমন করে টানে না। কবেকার ট্রেণে-দেখা মুখের স্মৃতির মতো আকস্মিকভাবে ধরা দিয়েই আবার হারিয়ে যায় মহীতোষ। টিক্‌লুকে মনে পড়ে। কিন্তু তাকে কাছে পাওয়ার জন্যে তেমন কোনো আবেগবোধ নেই আমার; গত একমাসে একবারও দেখা হয়নি তার সঙ্গে। ছবিটা সরিয়ে এনেছি শোবার ঘরের দেয়ালে; বিছানায় শুয়ে কখনো কখনো তাকিয়ে থাকি ছবিটার দিকে। বিশেষ কোনো বোধ

আলোড়ন তোলে না বুকে। হঠাৎই এক সময় মনে হয় আমি তাকিয়ে আছি ছবিটার দিকে, কিন্তু আমার চোখের মধ্যে টিকূলু নেই —পরিবর্তে ভাসছে একটা চৌকো আকৃতি, আর দেয়াল, আর অন্ধকার। একবুক শূন্যতায় হঠাৎই থেমে আসে নিঃশ্বাস।

সেদিন অফিস ছুটির ঠিক আগে পরিতোষ এলো। আমি আশা করিনি ; অপ্রস্তুতও হতে হলো খানিকটা। কাল ও ফোন করেছিলো। আমি ছিলাম না ; পরে দু'বার চেষ্টা করেও লাইন পাইনি। আজ সকাল পর্যন্তও বিশেষভাবে ওর কথা মনে ছিলো আমার। তারপর কাজ পড়লো, সময় যতো বাড়লো ততোই উৎসাহ কমে এলো আস্তে আস্তে। ভাবলাম, থাক, তেমন দরকার থাকলে পরিতোষ নিজেই হয়তো আবার ফোন করবে।

পরিতোষ বললো, 'ফোন করেছিলাম। খবর পাওনি ?'

'পেয়েছিলাম—।' অপ্রস্তুতভাবে হাসলাম আমি। 'তোমার যা অফিস, সব সময়েই লাইন এনগেজড্।'

'তা অবশ্য ঠিক।' নিজের মতো করে হাসলো পরিতোষ। 'আছো কেমন ?'

'এই, চলে যাচ্ছে।' নিজেকে সংক্ষিপ্ত করে বললাম, 'খবর কী ? টিকূলু ভালো আছে তো ? অনেকদিন তোমাদের দেখা নেই।'

'ছেলের খবরটা আগে দিই। ওকে স্কুলে ভর্তি করেছি।'

'সত্যি ! কোন স্কুলে ?'

'ডন বস্‌কোয়। দাদার ইচ্ছে ছিলো ক্যালকাটা বয়েজে দেবে, সীট পাওয়া গেল না। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত ধরে করে এখানে—'

আমি কি খুশি হবো ! সে-রকমই হওয়া উচিত। কিন্তু এই মুহূর্তে অভিমান চেপে ধরলো আমাকে, কৌতূহল থিতিয়ে এলো আস্তে আস্তে। স্পষ্ট বুঝতে পারি টিকূলুর জগৎ থেকে ক্রমশ মুছে যাচ্ছি আমি, অলক্ষ্যে যেভাবে বিকেল মুছে যায় আকাশ থেকে।

পরিতোষ কি ভাবলো জানি না। বললো, 'তুমি খুশি হলে না, বৌদি!'

'এটা কি অখুশি হবার মতো খবর!'

আলগোছে কথাগুলো ভাসিয়ে দিলাম আমি। ঘড়িতে পাঁচটা পঁয়ত্রিশ, সহকর্মীরা অনেকেই চলে গেছে। আর দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না।

রাস্তায় নেমে পরিতোষ বললো, 'চা খাওয়াবে?'

'চলো।'

'আর কিছুও খাওয়াতে পারো। চাকরি পাবার পর তো একদিনও খাওয়াওনি!'

জবাব দিলাম না। বুঝি পরিতোষের সহানুভূতি এখন আমার ভিতর পর্যন্ত ছুঁয়ে যাবার চেষ্টা করছে; মেঝে নিকনোর মতো এখন ও আমার সমস্ত গ্লানি শুষে নিতে চায়। এ সেই পরিতোষ, যাকে আমি কখনো পুরুষ বলে ভাবতে পারলাম না, যুবক বলে ভাবতে পারলাম না; আমার ভিতর থেকে উঠে-আসা বিকল্প সত্তার মতো যে ক্রমাগত ছায়া বিস্তার করে যাচ্ছে আমার ওপর! এই মুহূর্তে ওর সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এলো আমার। বড়ো অল্প আয়োজন নিয়ে আসো তুমি, পরিতোষ, এতো বড় অন্ধকার কি মোমবাতির আলো দিয়ে আড়াল করা যায়! বরং নির্দয় হও তোমার দাদার মতো; বরং তুমি দুর্ব্যবহার করো, যে-কোনো পুরুষের মতো আকাঙ্ক্ষা করো আমাকে, ডুবে যাও আমার চরিত্রহীনতার সমুদ্রে। আমি কিছু ভাববো না। বরং সম্পর্কের এই আকস্মিক পরিবর্তনই আমার স্বাভাবিক মনে হবে। আর কিছু নয়, তোমার প্রতি দুর্বলতাটুকু আমি কাটিয়ে উঠতে চাই—যে-কোনো রকমের সম্পূর্ণতা অর্জনের জন্যে তোমার এই পরিবর্তিত ভূমিকাটুকু আমার দরকার।

হাঁটতে লাগলাম চুপচাপ। আশেপাশে কলকাতা ছুটে যাচ্ছে দু'দিকে, শব্দের ভিতর থেকে জেগে উঠছে শব্দ—অবিরাম, নিয়মহীন

শব্দ। দৃশ্য থেকে আলাদা করে এই বিচিত্র ধ্বনিময়তায় কান রাখলে মনে হবে গোপনে কোথাও ভীষণ এক যুদ্ধ চলেছে ; তীব্রতম মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ওঠার প্রার্থনা শোনা যাচ্ছে দিকে দিকে। সংঘর্ষে আতুর বলেই এই প্রার্থনা নিয়ে যায় না কোথাও। যেমন এগোয় না আমার প্রার্থনা—প্রেম প্রতিহত হয় দাম্পত্যে এসে, অভিমান নিষ্পেষিত হয় শরীরে, শরীরের শোক ছুটে যায় সময়হীন শূন্যতার দিকে !

হঠাৎ কেমন নির্ভার মনে হলো নিজেকে। আজকাল প্রায়ই এ-রকম হয়, নিচে থেকে ওপরের দিকে তাড়া করে আসে সব বোধ, শুধু মাথাটা থাকে ভারী ও গম্ভীর হয়ে—ধড়হীন মুণ্ডের মতো।

অস্বস্তি লাগছিল। দাঁড়িয়ে পড়লাম।

'কী হলো, বৌদি !' আচম্বিতে হাতটা ধরে ফেললো পরিতোষ, 'কেমন টলে গেলে মনে হলো !'

'কিছু হয়নি,' ব্যাগ খুলে একটা লবঙ্গ বের করে মুখে দিলাম আমি। 'আজ গরম একটু বেশি, না ? দুপুর থেকেই মাথাটা কেমন ভার হয়ে আছে !'

'বাড়ি চলে গেলে পারতে !' আবার হাঁটতে হাঁটতে পরিতোষ বললো, 'লো প্রেসার হতে পারে। চেক্ করিয়েছো কখনো ?'

'সে-সব কিছুই নয়।' কার্জন পার্ক পেরিয়ে ট্রাম গুমটির কাছাকাছি এসে পড়লাম। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। দপ্ করে চোখের সামনে ভেসে উঠলো নিয়নগুলো। বললাম, 'গরমের জন্যেই এ-রকম হচ্ছে।'

'কিছু না হলেই ভালো।' পরিতোষ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

মুখের কথার সঙ্গে মিলছে না আমার ব্যবহার ; পরিতোষ ভাবছে আমি ওকে এড়িয়ে যাচ্ছি। কথাটা সতি, এড়িয়েই যাচ্ছি। তাছাড়া আর উপায় কী ! হয়তো বলা যেতো, পরিতোষ, সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি, নিজের সঙ্গে নিরন্তর লুকোচুরি খেলায় দম ফুরিয়ে আসছে—একদিন সত্যিই মুখ থুবড়ে পড়বো। হয়তো বিব্রত বোধ

করতো পরিতোষ, আরো একটু সহানুভূতিশীল হয়ে পড়তো আমার প্রতি। আর, এ-সব ক্ষেত্রে যা হয়, পরিচ্ছন্ন আবেগ উঠে আসতো ওর গলা দিয়ে, এক্ষুনি ট্যাক্সি ডাকতো, চলো ডাক্তারের কাছে। ছেলেমানুষ, কী ছেলেমানুষ! পরিতোষ, কবে তুমি বড়োদের মতো ভাবতে শিখবে, আবেগ দিয়ে শ্রান্তির চিকিৎসা করা যায় না; অন্তত আমার অসুখে আবেগ কোন প্রতিষেধক নয়!

মনে মনে হাসলাম আমি। পরিতোষের গাম্ভীর্য কাটেনি। ওকে স্বাভাবিক করার দায়িত্ব আমার।

ভাবতে দেরি হলো না। ঠিক করলাম পরিতোষের সঙ্গে আজ আমি ভীষণ খেলা খেলবো। বয়সটাকে পিছিয়ে নিয়ে যাবো দশ কি পনেরো বছর—যখন ছন্দ ছড়িয়ে থাকতো সর্বত্র, যখন ছুটতে গিয়ে ভুলে যেতাম হাঁটুর নমনীয়তা আর পড়তে পড়তেও হাসতে পারতাম সহজে। এই সব ভাবনা আমাকে খানিকটা সহজ করে দিলো।

রেস্তোরাঁয় ঢুকে একরাশ খাবারের অর্ডার দিলাম। যেমন-যেমন মনে এলো তাই বললাম। বয় অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো আমার মুখের দিকে, যেন এভাবে অর্ডার পাওয়াটা রীতি নয়। পরিতোষ বললো, 'করছো কি!'

'কেন, তুমিই তো বললে খাবে!'

'তা বলে এই ভাবে! কী খেতে ইচ্ছে করছে না করছে জিজ্ঞেস করবে তো!'

মেনুকার্ডটা হাতে নিয়ে বয়কে ঘুরে আসতে বললো পরিতোষ।

ওপর থেকে নিচে ওর চোখ নেমে যেতে দেখছি। মোটা ভুরুর ওপর ঈষৎ উঁচু কপাল, কোণের দিকের চুল ইতিমধ্যেই পাতলা হতে শুরু করেছে। শুধু কপাল ও চুলের কথা ভাবলে ও মহীতোষকেই মনে পড়িয়ে দেয়। মিল বলতে ওইটুকুই, কিছু বা পাওয়া যায় নাকের গড়নে। আর সবই পরিতোষের নিজস্ব।

'আমি চিকেন দো-পেঁয়াজা খাবো। তুমি?'

'আমি কিছু খাবো না।' বললাম, 'পরে চা নেবো।'

'তাহলে গোড়ার প্রস্তাবটাই থাক, শুধু চা—।' সিগারেটের জন্যে পকেট হাতড়ালো পরিতোষ, 'ভাবছো বেশি খরচ হয়ে যাবে, এই তো! না হয় আমিই খাওয়াচ্ছি—'

'পরিতোষ!'

'খাও, খাও। এক যাত্রায় পৃথক ফল করে লাভ কী!'

আর না করলাম না। খানিক আগেকার প্রতিশ্রুতি মনে পড়ে গেল—পরিতোষের সঙ্গে আজ যতোদূর সম্ভব স্বাভাবিক হবো।

বয় অর্ডার নিয়ে যেতে খোলামেলা চোখে আমার দিকে তাকালো পরিতোষ। সিগারেট ধরালো।

'পার্সোনাল ট্যালকমের বিজ্ঞাপনে তোমার ছবি ছেখলাম।'

'কোথায়?'

'স্টেট্‌সম্যানে। আজ আনন্দবাজারেও বেরিয়েছে।' একটু সময় নিলো পরিতোষ, ভাবলো কিছু। 'শীলা বলছিলো, দোকানের কাউন্টারেও নাকি দেখেছে।'

'সবাই জেনে গেছে!'

'জানবে না! শীলা তো মাকেও দেখালো।'

'সত্যি!'

পরিতোষ হাসলো, 'ভাষাটা শুনবে? ও মা, দ্যাখো দ্যাখো তোমার এক্স ডটার-ইন-ল'র ছবি বেরিয়েছে কেমন!'

কথাটা কানে লাগলো। জানাজানি হবে, জানতাম; তবে এই মুহূর্তে এইভাবে কথাটা উঠবে ভাবিনি। যেন হঠাৎ ধরা পড়ে গেছি—শরীর জুড়ে ঘন হয়ে এলো একটা ঠাণ্ডা স্রোত, এলোমেলো হয়ে পড়লো নিঃশ্বাস; স্পষ্ট অনুভব করলাম আকস্মিক ঘামে ছেয়ে যাচ্ছে শরীর।

খাবার এসে গেছে; ছুরি কাঁটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো পরিতোষ। চোখ নামানো। বোঝা যায় ক্ষুধার্ত। আমার দৃষ্টি আবার ওর কপাল ছুঁয়ে গেল।

'ছিঃ, মা কী ভাবলেন!'

কথাটা বেরিয়ে এল মুখ ফসকে; আমি বলতে চাইনি। খাবার থেকে মুখ তুলে পরিতোষ বললো 'বৌদি, তুমি একেবারে টিপিক্যাল বাঙালি মেয়ে! কারো ভাবনায় কি তোমার কিছু এসে যাচ্ছে! আফটার অল—'

কথাটা শেষ করলো না পরিতোষ। আচমকা বললো, 'খাচ্ছো না কেন? খাও!'

আঁচলের তলা থেকে ঘামে ভেজা হাতটা টেনে বের করলাম আমি। কাঁটাটা আলগোছে তুলে নিলাম হাতে। রেস্তোরাঁয় ঢোকার পরে খিদে টের পাচ্ছিলাম, এখন আর উৎসাহ নেই। পরিতোষ ঠিকই বলেছে, অন্যেরা আমার সম্পর্কে কী ভাবছে না ভাবছে তা নিয়ে আমি কেন ভাববো! সুব্রতর অনুরোধে যখন সায় দিয়েছিলাম তখন কি এ-সব আমার মনে পড়েছিলো? পড়েনি। তাহলে কি এটাই সত্যি, সম্পর্কচ্যুত হয়েও পুরনো সম্পর্কগুলোর মায়া কাটাতে পারছি না আমি, এখনো আমার মনে থেকে যাচ্ছে সেইসব চিন্তা—বিবাহিত জীবনে যেগুলো আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখতো!

দীনতার কথায় ছোট হয়ে যাই ক্রমশ। এই হীনমন্যতার হাত থেকে বাঁচার উপায় যে কী, ভেবে পাই না। শুধু বুঝতে পারি চলতে চলতে হঠাৎ থেমে পড়ছে সময়, আবার এগোতে হলে দেহের জোরে টানতে হবে মনকে, সেই একই ভাবে, বেতো ঘোড়ার মতো ঢিকুতে ঢিকুতে কোনোরকমে এগিয়ে চলা।

সন্ধ্যে উত্‌রে গেল। ময়দানের ভিতর দিয়ে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে লাগলাম। হাওয়া বেশ প্রবল আর ক্লান্তিহর, বর্ষার জল পেয়ে ঘন ও চিকন হয়ে উঠেছে মাঠের ঘাস, হাঁটতে হাঁটতে সুড়সুড়ি লাগছে পায়ে। কয়েকটা চোরকাঁটা বিঁধে গেল আমার শাড়িতে।

অনেকক্ষণ পরে পরিতোষ বললো, 'বৌদি, ভবিষ্যৎ নিয়ে তুমি কি কিছু ভাবছো?'

চোখ তুলে ওকে দেখলাম আমি। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় আবছা হয়ে আছে পরিতোষের মুখ। গায়ে পোষাক না থাকলে একটা বিষণ্ণ দারুমূর্তির মতো দেখাতো।

'হঠাৎ এ-কথা জিজ্ঞেস করছো ?'

কেন'র উত্তর এড়িয়ে গেল পরিতোষ।

'ভবছো কি না বলো ?'

'কী ভাববো !' কথার পিঠে কথা সাজানোর মতো করে বললাম, 'আমার কি সত্যিই কিছু ভাববার আছে! যা হয়ে গেল তার জের কাটাতেই কতোদিন লাগবে জানি না।'

'কিসের জের তুমি টানছো, বৌদি !' অসহিষ্ণু গলা পরিতোষের, বললো, 'মনের কথা জানা অবশ্য আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু, সামাজিক দিক থেকে তো তোমার কোনো অসুবিধে নেই। তোমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে অনেকদিন হলো। এখন তুমি স্বাধীন, যা ইচ্ছে করতে পারো !'

পরিতোষ কী বলতে চাইছে এবং কেন, আমাকে জড়িয়ে কেনই বা আজ ওর এতো কথা মনে আসছে বুঝতে পারি না। অনেকদিন পরে দেখা হলো, ভেবেছিলাম, আজ খুব সহজভাবে মিশবো পরিতোষের সঙ্গে—অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ কিছুই থাকবে না আমার সামনে। মনে হচ্ছে পরিতোষের ইচ্ছে অন্যরকম, প্রশ্ন আর অস্পষ্টতা দিয়ে সে আমাকে সম্পূর্ণ ওলটপালট করে দিতে চায়।

আমি দ্বিধায় পড়লাম। পরিতোষের কথাগুলো ঘোরাফেরা করতে লাগলো আমার চারদিকে। হাওয়ার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পর পর ওর দেশলাই জ্বালার শব্দ কানে এলো, তামাকের গন্ধময় এক ঝলক হাওয়া ছুটে গেল আমার সামনে দিয়ে। এখন আমার দরকার যে-কোন উত্তর; যে-কোন কথার জন্যে নিজের ভিতর পর্যন্ত ডুব দিলাম আমি। কিন্তু, এমন কিছু মনে এলো না যা দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারি পরিতোষকে। একবার ইচ্ছে হলো বলি, পরিতোষ, আমার

ভাবনা আমাকেই ভাবতে দাও। একে একে তো সকলেই ছেড়ে গেছে আমাকে ; জামার শেষ বোতামটির মতো কোন হিতাকাঙ্ক্ষা আমাকে তুমি আমাকে উপহার দিতে চাও! হারতে হারতে এখন প্রায় শূন্যে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছি, তোমার সামান্য দান কোন শূন্যতা ভরে দিতে পারে! বরং তুমি যাও। ভবিষ্যৎহীন আমি থাকবো যেমন-তেমন করে —শীত ও অবসাদ ঢুকে পড়ুক আমার মধ্যে। এইভাবে যদি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাই, সেটাই হবে আমার ভবিষ্যৎ। আর, ভবিষ্যৎ থাকে বর্তমান-নির্ভর হয়ে, এটাই তো সত্যি কথা! আজ, এই মুহূর্তে, যে-আমাকে তুমি দেখছো, সত্যিই কি সে কোনো কিছুর ওপর নির্ভর করতে পারে!

আমি কিছুই বললাম না। যদি পারে, পরিতোষ নিজেকে গুটিয়ে নিক।

নিঃশব্দে হাঁটতে হাঁটতে পরিতোষ বললো, 'শুধু টিক্‌লুর খবর নয়, আজ তোমাকে আর একটা খবরও দিতে এসেছিলাম।'

আবেগহীন, গম্ভীর গলা পরিতোষের। অল্প কেঁপে উঠলাম আমি। প্রশ্ন আছে, জবাবটা কী হতে পারে অনুমান করতে না পেরে নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে এলো। শেষ হয়ে আসা জ্বলন্ত সিগারেটটা সামনের নিরাকার শূন্যে ছুঁড়ে দিয়েছে পরিতোষ, সেটাকে ঘুরে ঘুরে নেমে আসতে দেখলাম। তারপর মাটিতে পড়ে কোথায় হারিয়ে গেল নিঃশেষে।

পরিতোষ বললো, 'দাদা বোধহয় আবার বিয়ে করছে।'

হয়তো দাঁড়িয়ে পড়তাম, হয়তো আকাশে হাত ছুঁড়ে চেঁচিয়ে বলে উঠতাম, না, আমি বিশ্বাস করি না। যা ঘটছে তার সবটাই ভাগ্য ; কিন্তু, বিশ্বাস করো, আমাদের ভালোবাসায় কোনো ভান ছিলো না—রাগে কিংবা দুঃখে আজও আমি একটি মুখই দেখতে পাই, সে-মুখ মহীতোষের। পারস্পরিক কোনো প্রবঞ্চনাই তাকে নষ্ট করতে পারে না।

আবেগ আমাকে সেই দিকেই নিয়ে যাচ্ছিলো। কোনোরকমে সামলে নিলাম। দাঁতে দাঁত বসিয়ে, চোয়াল এঁটে, গোটা শরীরে

আনতে চাইলাম দৃঢ়তা, যাতে নিজেকে এতটুকু বিচলিত না দেখায়। এখন শুধু এইটুকুই দরকার, বললাম নিজেকে, শান্ত হও, শক্ত হও— ভবিষ্যৎ কথাটার একটা অর্থ এতোক্ষণে ধরা দিচ্ছে।

'বললাম বোধ হয়, কিন্তু খবরটা পাকা।' যে-টুকু সময় দেবার দিয়ে পরিতোষ বললো, 'শুনছি ক্যামাক স্ট্রীটে নতুন ফ্ল্যাট নিয়েছে —'

'ভালোই তো।' আস্তে আস্তে স্বাভাবিক করে নিচ্ছি নিজেকে, 'তোমরা নিশ্চয়ই খুশি হয়েছো!'

'আমাদের খুশি অখুশির কিছু নেই এতে। ডিভোর্সের ব্যাপারেও কি আমরা খুশি হয়েছিলাম!'

'আমি তা বলছি না— '

পরিতোষের অভিমানে ঘা দিতে সাহস হলো না। বললাম, 'যেমনই হোক, এটা একটা আনন্দের ব্যাপার। তোমরা না হও, তোমাদের দাদা নিশ্চয় খুশি হয়েছে—'

নিজের কানেই খারাপ লাগলো কথাটা। ঠিক অভিমান নয়, অর্থহীন একটা জ্বালা যেন আমার মুখে কথা জুগিয়ে যাচ্ছে!

পরিতোষ জবাব দিলো না। আবার আলোর মধ্যে ফিরে আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। মাঠের হাওয়া আর ফাঁকা রাস্তায় এতোটা হেঁটে এসেও কপালের ঘাম শুকোয়নি। চোখমুখ উদ্‌ভ্রান্ত; যেন আমি নয়—পরিতোষ নিজেই কোনো একটা সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছে, উদ্ধারের রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না!

মহীতোষ আবার বিয়ে করছে, এটা কি আমারও সমস্যা! তখন হঠাৎ খবরটা শুনে কেমন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিলাম। এখনও বিশৃঙ্খলা যায়নি, শিরায় শিরায় পরিষ্কার অনুভব করছি উত্তেজনা; তবু ধাতস্থ হয়ে ভাবতে গিয়ে মনে হলো, যতোই কষ্টের হোক একটা ভুল ধারণা আঁকড়ে বসেছিলাম এতোদিন। ভালোবাসার যদি কোনো শর্ত থাকে আমিও কি তা পালন করেছি পুরোপুরি, না কি করছি! প্রকাশ্যে হোক বা আড়ালে, প্রণয়ের চিহ্নগুলো পাল্টে যাচ্ছে রোজ; উদাসীনভাবে

হলেও, বিচ্ছেদের পর থেকে এতোদিন পর্যন্ত আমিও কি অস্বীকার করে যাচ্ছি না মহীতোষকে! তাহলে মনীশ কে? বা, শেখর—মাত্র একটি চুম্বনের সুযোগ ছাড়া আর কিছু না দিলেও যার সঙ্গে একটি দিন ও রাত আমি কাটিয়ে এলাম শান্তিনিকেতনে? বা, সুব্রত? সুব্রত যেদিন কানের কাছে ঠোঁট নামিয়ে এনেও আবার ফিরে গিয়েছিলো হঠাৎ, সেদিন কি আমার নিঃশ্বাস প্রত্যাশায় ঘন হয়ে ওঠেনি! যদি এর সবগুলোই ভুল হতো, নিতান্তই অসহায়তার দাম বলে এগুলোকে মেনে নিতে পারতাম, তাহলেও কি বলা যেতো, অন্যায়, তুমি আমার ওপর অবিচার করছো মহীতোষ!

'তুমি বোধহয় আমার কথাই জানতে চাইছো? হালকা হয়ে বললাম পরিতোষকে, 'আমিও খুশি হয়েছি।'

ক্লান্ত লাগছিলো। অফিস থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ রেস্তোরাঁয়, তারপর থেকেই সমানে হেঁটে চলেছি। আর ভালো লাগছে না। অবসাদ আমার বুক থেকে ছুটে যাচ্ছে মাথার দিকে, অবসাদ আমার সমস্ত শরীরে। এবার ফিরে যাবো।

পরিতোষ কিছু বলছে না দেখে বললাম, 'তুমি কি আরো হাঁটবে, পরিতোষ?'

ভেরী সরি!' পরিতোষ হঠাৎ তৎপর হয়ে উঠলো, 'দাঁড়াও একটা ট্যাক্সি ডাকি। তোমাকে পৌঁছে দেবো।'

খুঁজতে হলো না। হর্ণ দিতে দিতে দূর থেকে একটা ট্যাক্সি আসছিলো, পরিতোষ দাঁড় করালো।

বললাম, 'বাড়িতে চলো, রাত্রে খাবো একসঙ্গে। আজকাল তো আসোই না!'

পরিতোষ হাসলো শব্দ করে, যেন খুব মজা পেয়েছে। তারপর বললো, 'লক্ষ করছো, বৌদি, আমাদের মধ্যেও সম্পর্কটা কেমন ফরমাল হয়ে যাচ্ছে!'

বারো

সেদিন বিকেলে হঠাৎ খুব জোরে বৃষ্টি নামলো। বর্ষা শেষ হয়ে গেছে কবে, এই সময় সাধারণত এ-রকম বৃষ্টি হয় না। ট্রামে ফিরতে ফিরতেই দেখলাম মেঘে মেঘে ক্রমশ কালো হয়ে আসছে আকাশ, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন। তাড়াহুড়ো করে বাড়ি পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই ভিজে গেলাম।

লন পেরিয়ে বারান্দায় উঠতে যাবো, দেখি শোভার মা দাঁড়িয়ে আছে দরজা খুলে। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো।

'একটা দাদাবাবু বসে আছে ঘরে—'

বললাম, 'কে, পরিতোষ ?'

শোভার মা একবার দরজা দিয়ে ভিতরে তাকিয়ে নিলো; তারপর নিচু গলায় বললো, 'না, না, সে কেন হবে ! তাকে তো আমি চিনি। এ অন্য লোক। বাচ্চা মতন, বলছে নাকি তোমার ভাই হয়।'

'ভাই—!' ভিজে কাপড়ে এমনিতেই ঠাণ্ডা লাগছিলো। শোভার মার কথায় মুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে এল হাত পা। ঘরের ভিতর থেকে কাশির শব্দ কানে এলো। এখান থেকে কিছুই দেখা যায় না; দুখানি তো ঘর—মনে হচ্ছে যে এসেছে সে শোবার ঘরেই আশ্রয় নিয়েছে।

'কখন এলো ?'

'এই তো, তোমার আগে আগে। চা করতে বসেছে—'

'যাকে তকে ঘরে ঢোকাও, যদি চোর বদমাইস কিছু হয় ! কী যে করো তুমি !'

'না গো, সে-রকম নয়। চোর বদমাইস হলে ঢুকতে দিতাম নাকি !'

ওকে এতোটা নিশ্চিন্ত দেখে ভরসা হলো। বুকের ওপর ভিজে শাড়ির আঁচলটা গোছাতে গোছাতে জিজ্ঞেস করলাম, 'শোবার ঘরে বসেছে ?'

'হ্যাঁ।' একটু থেমে বললো শোভার মা, 'দোতলার বাবু এসে কী কথা বললো, তোমার কীরকম ভাই হয়, এইসব। তা দাদাবাবু বললে তোমাকে নাকি চিঠি দিয়েছিলো আসার আগে —'

সমস্ত কথাবার্তাই কেমন বিভ্রান্তিকর, রহস্যের মতো লাগে। আমি ছাড়া ত্রি-সংসারে আমার কেউই প্রায় নেই ; আত্মীয়-স্বজন দু' চারজন আছে এদিক ওদিকে ছিটিয়ে, কারুর সঙ্গেই যোগাযোগ নেই কোনো। বা তেমন যদি কেউ থাকেও, আমার ঠিকানা পাবে কোথায়! এইসব ভাবতে ভাবতে আমি ভিতরে ঢুকলাম।

শোবার ঘরের দরজার বাইরে অল্প কাদার দাগ লাগা একজোড়া জুতো পড়ে আছে, চেহারা দেখে মনে হয় অনেকদিন পালিশ পড়েনি। দু' এক মুহূর্ত জুতোর দিকে তাকিয়ে থেকে ভয় ভাঙানোর গলায় শোভার মাকে ডাকলাম আমি, তারপর পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম।

যে এসেছে আমাকে দেখে সে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো। মাথার ঝাঁকড়া চুলে হাত চালাতে চালাতে অপ্রস্তুত হেসে বললো, 'চিনতে পারছেন না!'

আমি চিনলাম ; কিছুটা গলার স্বর শুনে, কিছুটা চোখের দিকে তাকিয়ে। গভীর, টলটলে, এমন মেয়েদের মতো চোখ সচরাচর চোখে পড়ে না। আমিও একবারই দেখেছি, মাত্র একটি দিনের কয়েকটি মুহূর্তের সেই দেখা আমার সামনে পরিষ্কার ছবির মতো ভেসে উঠলো।

'খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে।' চন্দনকে বললাম, 'এই নাকি তুমি চিঠি দিয়ে এসেছো!'

'আপনার সব শোনা হয়ে গেছে!'

'হবে না!' কপট তিরস্কারের গলায় বললাম, 'আমি ভাবছি কে না কে! বসো, আসছি।'

আলনা থেকে নতুন শাড়ি জামা নিয়ে বাথরুমে গেলাম। তখন

খেয়াল হলো, আমি ওপর ওপর কথা বলেছি মাত্র ; হঠাৎ না জানিয়ে চন্দনের এইভাবে চলে আসা, শোবার ঘরে গিয়ে বসে থাকা এবং চিঠি দিয়ে আসার কথা বলা, এ-সবের অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে। আশ্চর্য, এই ব্যাপারগুলো প্রথমেই খেয়াল করা উচিত ছিলো আমার! অথচ, কী হয়েছে আমার, চন্দনকে দেখামাত্র আগের মুহূর্তের সমস্ত উদ্বেগ অন্তর্হিত হলো, যেন ওর হঠাৎ আবির্ভাবের মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই - আমি সেইভাবেই কথা বললাম!

ইচ্ছে করেই একটু গম্ভীর হলাম আমি। ঘরে ঢোকার পর চন্দন বললো, 'আপনি রাগ করেননি তো, নমিতাদি!'

'রাগ করবো কেন!' শোভার মাকে চায়ের তাগাদা দিয়ে বললাম, 'হঠাৎ এইভাবে চলে এলে যে!'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো না চন্দন। ঈষৎ বিভ্রান্ত মুখ চোখ, কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। পরে বললো, 'দিন দুয়েক থাকতে দেবেন আমাকে ? একটা ব্যবস্থা দেখে আমি নিজেই চলে যাবো!'

আমি একটু কাঁপলাম। বুঝতে পারছি আমার অনুমানে ভুল হয়ে গেছে, গোড়ায় যা ভেবেছিলাম, ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। চন্দন কোনো একটা মতলব নিয়ে এসেছে! সেই মতলবটা কী আমাকে তা জানতে হবে। ক্রমশ মনে পড়তে লাগলো সমস্ত ঘটনা, চন্দনের সঙ্গে আমার একদিনই দেখা হয়েছিলো—সেদিনের সমস্ত ঘটনা আর কথাবার্তা। মনে হলো, হয় চন্দন বাড়িতে ঝগড়া করে এসেছে, না হলে আরো গভীর কোনো ব্যাপার আছে এর মধ্যে—পুলিসের তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে না তো! এ-রকম তো হামেশাই হচ্ছে আজকাল! আমাদের অফিসের একাউন্ট্যান্ট মধুসূদনবাবুর মেজো ছেলে এইভাবে নিরুদ্দেশ হয়েছিলো, একমাস পরে মৃত অবস্থায় পুলিস তাকে খুঁজে পায় হাসপাতালে, মধুসূদনবাবুই তাকে সনাক্ত করেন হাসপাতালে গিয়ে।

ঘটনাটা মনে পড়ায় নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এলো আমার।

মধুসূদনবাবু অফিসে আসা বন্ধ করেননি, কিন্তু চাল চলন আর আলাপে তাঁকে আর চেনা যায় না। কাজ করতে করতেই উদাসীন হয়ে যান মাঝে মাঝে, নিজের মনেই কী সব কথা বলেন বোঝা যায় না। মধুসূদনবাবুর মুখের দিকে তাকালে আজকাল আমি একটা ছায়া দেখি, ধূসর ও বিবর্ণ, ছায়াটা ছড়িয়ে পড়েছে চোখের দৃষ্টিতেও। একেই মৃত্যুর ছায়া বলে!

চন্দন সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে আমার এইসব কথা মনে হলো। আশঙ্কা সত্যি হলে ওকে আশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। বলা যায় না, শুধুমাত্র এই কারণেই হয়তো পুলিস আমাকে নিয়েও টানাটানি করবে! আমি ওকে চলে যেতে বলবো!

চন্দন তখনো তাকিয়ে আছে আমার দিকে। নির্বিকার মুখ, হয়তো আগের চেয়ে একটু মলিন হয়েছে, হাসিতে টলটল করছে চোখ দুটো। ওই মুখের দিকে তাকালে ফেরাতে ইচ্ছে করে না। তাছাড়া, ভাবলাম, এমনও তো হতে পারে, আমার ধারণা সবটাই ভুল—অনুমান থেকে আশঙ্কা ডেকে আনছি আরো!

প্রায় মনঃস্থির করে ফেললাম আমি। বললাম, 'চা দিয়েছে। এসো আমরা বাইরের ঘরে গিয়ে বসি।'

ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়েছিলো। বাইরে তাকালে অন্ধকার চোখে পড়ে স্পষ্ট। বৃষ্টিও পড়ে যাচ্ছে সমানে; দৃশ্য থেকে চোখ ফেরালে এখন শব্দ ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। নোয়ার নৌকোর গল্পটা মনে পড়ে যায় আমার—গতানুগতিক আবহ থেকে আলাদা হয়ে পৃথিবী ডুবে যাচ্ছে অতলে! শুধু থেকে যাচ্ছে শব্দ, বৃষ্টিও নয়—শুধু অকাল বর্ষণের শব্দ। ঠিক বুঝতে পারছি না, প্রাকৃতিক নিয়মে এই শব্দ ক্রমশ সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে আমার মধ্যে, নাকি এর গভীরে আছে আরো কোনো তাৎপর্য—গভীর ও নিঃশব্দ কোনো তাৎপর্য, পিঁপড়ের সুড়ঙ্গের যাবার মতো যা চলে যাচ্ছে আমার সমগ্র অস্তিত্বের মধ্যে দিয়ে! যেমনভাবে ঝরে যায় রক্ত,

নিঃশব্দে ; যেমনভাবে বাস্তবকে পাশে ফেলে ধীরে ধীরে জায়গা করে নেয় স্মৃতি, একসময় আর বাস্তব বলে কিছু থাকে না ! সত্যি সত্যিই এমন দিনও ছিলো যখন অবিরাম বৃষ্টিতে নিজের অজান্তে নেচে উঠতাম আমি। আজ ! বৃষ্টিহীন বৃষ্টির শব্দ আজ শুধু অবিরাম ধুয়ে দিচ্ছে আমার বুক, আমার এই মুহূর্তের সমস্ত অনুভব !

স্বপ্ন থেকে ঘুম ভাঙার মতো ভাবনাটা তরল হয়ে এলো। খুব জোরে হেসে উঠতে ইচ্ছে করলো আমার। মাঝে মাঝে সকলকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করে, ছাখো, কেমন ভাবুক হয়ে উঠেছি। তোমরা আমাকে আলাদা করে দিলেও ভাবনা এসে অনবরত ভরে দিচ্ছে ফাঁকগুলো—হয়তো এটাই নিয়ম, কিছুই অসম্পূর্ণ থাকে না কখনো !

না, থাকে না। আমিও থাকিনি। আমার বিপদ, আমার নিঃসঙ্গতা, ক্ষয় থেকে ক্ষয়ে আমার দিনযাপন যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি আমার অনুভব আর লক্ষ্য। তুলনা দিয়ে বলা যায়, যেন একটা হাত-পা বাঁধা পশু ; হাত-পা বাঁধা বলেই তাকে সইতে হচ্ছে লাঞ্ছনা আর কষ্ট, ওরই মধ্যে কোনো কোনোটিকে সে সয়ে নিচ্ছে ছাড়া পাবার উপায় হিসেবে —হয়তো এর মধ্যে দিয়েই একদিন সে ছাড়াও পেয়ে যায়। এইভাবে, দিনে দিনে, আমার সমস্ত ব্যথা ও বিক্ষোভ নিয়ে আমিও কি ধীরে ধীরে ধাবিত হচ্ছি না সেই লক্ষ্যের দিকে—যার শেষে আছে আশ্রয়, আছে নিশ্চিন্ত আর উদার অনুগ্রহ ! হয়তো ভালোবাসাও আছে, আমি তার সংস্পর্শ অনুভব করি না। ও-নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামানোর প্রয়োজনও বোধ করি না আজকাল। একসময় খুব স্পষ্ট ধারণা ছিলো ভালোবাসা সম্পর্কে, প্রায় জ্যামিতির ছকে মাত্র কয়েকটি উপসর্গ দিয়ে ধারণাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম অনেকদিন। দিন গেল ; আস্তে আস্তে বুঝলাম, কী পল্‌কা সব ধারণার ওপর দাঁড় করিয়ে রেখেছি ভালোবাসার অনুভবগুলিকে ! আকাশের মতো এখন তাকে ব্যাপ্ত হতে দেখছি চারিদিকে—ছোটো, বড়ো, উজ্জ্বল আর নিষ্প্রভ তারায় তারায় ছড়ানো এক আকাশ, এর মধ্যে আলাদা করে বেছে

নেওয়া যায় না কোনটিকে—নিতে হলে সবটাই নিতে হয়। কিন্তু, নেওয়া কি অতোই সহজ! তার চেয়ে সহজ বিস্মৃত হওয়া, তীব্র কোনো আকর্ষণ না রাখা—খরার আকাশে দৈবাৎ মেঘের মত ধরা দিলে সে নিজেই এসে ধরা দেবে। না হলে যদি উচ্চাশা থাকে, ঠকতে হবে। এতোদিন ধরে ঠকেই এসেছি আমি; দেহমনের যা কিছু ছিলো আমার নিজস্ব আর গোপন, প্রতিদিনের আশায় প্রায়ই তার স্বাদ পেতে দিয়েছি অন্যকে। পরিবর্তে কী পেলাম আমি! মহীতোষ বিয়ে করলো আবার। এখন নিশ্চিত আমার জন্যে তার মনে আর কোনো অভাববোধ নেই, ভালোবাসা বা আকর্ষণ তো নেই-ই। এ-সবই আমি অভিজ্ঞতা দিয়ে ধরে নিতে পারি। তবু, মহীতোষ যেদিন বিয়ে করলো—মনীশ আমাকে ফোন করে জানালো ওদের রেজিষ্ট্রি হয়ে গেছে, সেদিন সারারাত কেন ঘুম এলো না চোখে! সারারাত জুড়ে উচ্ছৃঙ্খল হাওয়া ছুটে গেল আমার আশপাশ দিয়ে—মৃতদেহে মাটি ছড়ানোর অভিপ্রায় নিয়ে তাদের সেই নিঃশব্দ যাতায়াত প্রবলভাবে জাগিয়ে রাখলো আমাকে। চেষ্টা সত্ত্বেও আমি ভুলতে পারছিলাম না আমাদের বিয়ের রাত। পৃথিবীর যাবতীয় শব্দ স্তব্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে, শুধু আমার চারিদিক জুড়ে, কানে, নিঃশ্বাসে, হৃৎপিণ্ডে, দমকলের শব্দের মতো পর পর ও একাগ্র হয়ে বাজতে লাগলো সানাইয়ের ধ্বনি।

এটা হতো না যদি দিনের পর দিন ভালোবাসার ধারণাটিকে আশায় আশায় উস্কে না রাখতাম। এখন বুঝতে পারি। আর, বুঝি বলেই দেখছি রাতারাতি কেমন বদলে গেলাম আমি।

হ্যাঁ, এটাকে পরিবর্তনই বলা যায়। কিছুদিন থেকেই অনুভব করছি মহীতোষ আর তেমন করে হানা দেয় না মনে। পরিতোষ টিকলুর দায়িত্ব নেবে বলে কথা দিলে একটা দুর্বহ ভার নেমে গেল আমার বুক থেকে। কিন্তু চিন্তা গেল না—সে শুধু টিকলু এখনো শিশু বলে। সন্তানের জন্যে যে-টুকু জোর আমি অনুভব করতে

পারতাম, বা অধিকার, দীর্ঘ সময় ধরে তা থেকে বঞ্চিত হতে হতে আস্তে আস্তে এটাও আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। সংসারে কে কার আশ্রয়, কে কার নির্ভর, কে বলতে পারে! ধানের চারার মতো এক মাটি থেকে আর-এক মাটিতে বুনে দেওয়া হলো টিকলুকে। সম্ভবত এটাই তার ভাগ্য আর সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়; এখন থেকে সে বড়ো হবে একটু একটু করে, একটু একটু করে ভুলে যাবে তার পিছুটান। আমার কথা বলতে পারি, এখন আমি আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বার্থপর। মানুষ সব পারে, পারে না একা হয়ে থাকতে; খাদ্যের মতো সঙ্গও তার বড়ো প্রয়োজন।

মনে হচ্ছে আমি লক্ষ্যের কাছাকছি পৌঁছে গেছি। গতকাল ও পরশু, দু'দিন অনেকটা সময় আমি আর সুব্রত এক সঙ্গে কাটালাম। একসঙ্গে, বন্ধুর মতো, পরস্পরের স্পর্শহীন সান্নিধ্যে। যেন পাশাপাশি দুটো গাছ, আমাদের হাওয়া ছুঁয়ে গেল পরস্পরকে। অনেকদিন এ-রকমভাবে থাকিনি। সত্যি বলতে, আমার অভিজ্ঞতায় এটা প্রায় আশাতীত ব্যাপার।

খুব ভুল ভাবছি কী! ভেবে দেখলে পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক বিষয়ে একটি ধারণাই আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিলো;—শরীর আর শরীর, যার সংঘর্ষে কোষে কোষে জ্বলে ওঠে আগুন, এ-টুকু ছাড়া আর কিছু দেবার নেই, নেবারই বা কী আছে! ঠিক মনে পড়ে না এই বিনিময়ের শুরু করেছিলাম কবে। তবে বহুদিন হয়ে গেল। ওপর ওপর এখনো আমি রয়েছি আগের মত টান-টান ও অটুট; কিন্তু ভিতরে তাকালে বুঝতে পারি সব—কোয়া তুলে নেওয়া কাঁঠালের মতো অহঙ্কারহীন এক অস্তিত্ব। এখন নিজেকে জাগিয়ে তুলতে হয় যান্ত্রিক উপায়ে। ভয় করে, বড্ডো ভয় করে। নিকট পরিচয়ের বাইরে ইদানীং কারুর সঙ্গে দেখা হলেই শঙ্কায় কুঁকড়ে আসে শরীর—ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ি, কি জানি, আরো এক ভালবাসার অভিনয় করতে যাচ্ছি না তো! সুব্রত সম্পর্কেও যে এ-রকম আশঙ্কা ছিলো না তা

নয়। তবু, ক্ষতের ওপর পরিচ্ছন্ন ছাল পড়ার মতো, ওর সঙ্গে মিশতে মিশতে দেখলাম কখন আমি অবিশ্বাস্য রকমের সহজ হয়ে পড়েছি। কাজের সূত্রে আলাপটা পড়ে থাকলো দরজার পর্দার মতো, নিছক ভূমিকা হয়ে। 'পার্সোনাল' ট্যালকমের পর আমাকে আরো কয়েকটা মডেলের কাজে নিলো সুব্রত—একটা প্রচার ছবিতে অভিনয় পর্যন্ত করলাম। এ-সবই ভূমিকা। এ-সবের মধ্য দিয়ে ক্রমশ যে আমি একটা দূরত্ব অতিক্রম করে চলেছি, এটা বুঝতে সময় লেগেছিলো।

ইদানীং উপার্জন কম হচ্ছিলো না। ভাবছিলাম গাইডের চাকরিটা ছেড়ে দেবো। মজার ব্যাপার, আর কাউকে না বলে ইচ্ছের কথাটা সুব্রতকেই বললাম প্রথম, যেন আমি ওর ওপর নির্ভর করতে পারি। কথা হচ্ছিলো পার্ক স্ট্রীটের এক রেস্তোরাঁয় বসে। স্টুডিও থেকে বেরিয়ে আমি আর সুব্রত ঢুকেছি এখানে, সন্ধ্যে উতরে গেছে। আজ আমার মন অনেকটা হালকা ছিলো, আলাপে আলাপে অনেক দিনের জমা কথার কিছু কিছু ছড়িয়ে দিয়েছি। শ্রোতা হিসেবে সুব্রত নিশ্চয়ই খুব ভালো, মাঝে মাঝে সিগারেটের ধোঁয়ার আড়াল থেকে দেখতে পাচ্ছি ওর উদ্ভাসিত মুখ। 'ওটা কোনো সমাধান নয়,' শুনে বললো, 'জীবিকা বদলালেই জীবন বদলে যায় না। আমার মনে হয় যা পেলে আপনি খুশি হতেন সেটার সঙ্গে চেঞ্জ অফ প্রফেসানের বিশেষ সম্পর্ক নেই।' ঘন চোখে আমার দিকে তাকালো সুব্রত, অপেক্ষা করলো। তারপর বললো, 'ভেবে দেখবেন, আমি বোধহয় খুব ভুল বলিনি।' ওর কথায় চাতুর্য ছিলো, হয়তো দ্বিতীয় কোনো অর্থও মেশানো ছিলো—না হলে আমি এতোটা আলোড়ন বোধ করতাম না। যাই হোক, পরশু আমরা একসঙ্গে সিনেমা দেখলাম। ফেরার পথে, সুব্রত পৌঁছে দিচ্ছিলো, বললো, একদিন আমাকে নিয়ে যাবে তাদের বাড়ি, তার মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। আমার ভালো লাগলো। আর-কিছু না হোক, এর মধ্যে আছে কিছুটা নতুনত্ব আর বৈচিত্র্য। আমি সুব্রতর প্রায়

কিছুই জানি না। সুব্রতও আমার সম্পর্কে অল্পই জানে, বাকিটুকু জানার জন্য কৌতূহল দেখায়নি কোনো। ও জানে আমার বিয়ে হয়েছিলো, ডিভোর্স হয়ে গেছে—এই পর্যন্ত। এমন কি মহীতোষের নাম পর্যন্ত জানে না, এটাই আমার পক্ষে সবচেয়ে খুশির কথা। এই প্রথম একজনকে দেখলাম যে বর্তমান থেকেই ভেবে নিতে পারে আমাকে, আমার অতীত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আর নিরপেক্ষ করে। সে মনীশ নয়, শেখর নয়, উৎপল নয়, এমন কি মিস্টার সরকারও নয়—উপলক্ষ যাই হোক, বোধহয় এদের কাউকেই আমি এতোটা গ্রহণ করতে পারতাম না। তারপর আবার আমাদের দেখা হলো গতকাল বিকেলে, কাজের বাইরে—মনে হলো দু'জনেই অপেক্ষা করছিলাম এর জন্য। কাল সারাদিন কাজ ছিলো না অফিসে, সারাক্ষণ বসে বসে ভাবছিলাম ফোন করবো সুব্রতকে। সাহস হলো না। মাঝখানে একবার মিস্টার সরকার ডাকলেন ফোনে। প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষীর মতো এখনো মাঝে মধ্যে উনি আমার খোঁজ-খবর নেন; বিকেলে চা খেতে ডাকছিলেন ওঁর বাড়িতে। আমি দ্বিধায় পড়লাম। প্রায় রাজী হয়েও সাবধানে ফিরিয়ে নিলাম নিজেকে। বার বার মনে হচ্ছিলো, সময় যায়নি, হয়তো আরো কিছুক্ষণ আমি অপেক্ষা করতে পারি। কী আর এমন শক্ত কাজ, ভাবলাম নিজের সঙ্গে এ-রকম প্রবঞ্চনা এর আগেও তো অনেকবার করেছি—না হয় তার সঙ্গে যুক্ত হবে আরো একটি ব্যর্থতা! দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে গেল। ছুটির পর বিমর্ষ হয়ে হাঁটছি ফুটপাথ ধরে, পাশে এসে গাড়ি থামালো সুব্রত। প্রায় একটা সাজানো-গোছানো দৃশ্য, সিনেমায় যেমন হয়। 'এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম—', কথাটা মিথ্যে বলেই আর বেশিদূর এগোতে পারলো না সুব্রত। আমি কিছু বললাম না। মাঝে মাঝে এ-রকম হয়, যখন ক্লান্তিকেই আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে সবচেয়ে বেশি, ভালো লাগে স্তব্ধ হয়ে থাকতে। চুপচাপ থেকে স্নায়ুগুলোকে বিশ্রাম

দিলাম আমি, এতোক্ষণ তারা অনেক চাপ সহ্য করেছে। 'দেখা হয়ে ভালোই হলো,' সুব্রত বললো, 'কাল একবার বাইরে যাচ্ছি—'

চন্দনের কাছ থেকে তেমন কোনো খবর বের করা গেল না। এ-টুকু বুঝলাম, সে এসেছে এবং থাকবে। কতোদিন থাকবে এবং এইভাবে হঠাৎ চলে আসার কারণ কী, কিছুই ভাঙলো না। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে এর বেশি আর-কিছু সে বলতে রাজী নয়। বললো, 'দু'একদিন থাকলে আপনার অসুবিধে হবে, নমিতাদি?'

'না, না। অসুবিধে কেন হবে!' ভাবনা গেল না। তবু ওকে আশ্বস্ত করার জন্য বললাম, 'আমি তো একাই থাকি, তুমি থাকলে ভালোই লাগবে।'

চন্দন বললো, 'আমি কোনো ঝামেলা করবো না—'

অন্যমনস্ক ছিলাম। মন কেমন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে—ভিতরে ভিতরে ভেবে যাচ্ছি গতকাল ও পরশুর কথা ; এ-ব্যাপারে যতোটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত দিতে পারছি না। একেকবার ভাবছি কী আর তেমন ঘটনা ; আছে, থাকবে, ইচ্ছে হলে চলে যাবে। তেমন কোনো অসুবিধে হলে মানসীকে বলবো—যদিও চন্দনের কথাবার্তা শুনে মনে হয় ও যে এখানে এসেছে বা আসতে পারে মানসী তা জানে না। জানলে কি আসতে দিত!

এ-সব ভাবনায় লাভ নেই কিছু। আপাতত একটি চিন্তাই মনঃস্থির করতে সাহায্য করলো আমাকে—চন্দন এসেছে কিছুটা নিরুপায় হয়ে, সম্ভবত তার আর কোথাও যাবার উপায় ছিলো না। এই অবস্থায়, যতো সামান্য পরিচয়ই থাক, ফেরানো উচিত হবেনা তাকে। হয়তো কথাটা উচিত অনুচিতেরও নয়, নিছক অবলম্বনের। নিজেকে দিয়েও তা অনুভব করতে পারি।

বৃষ্টিটা ধরে গেছে। আর কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। আমাদের চুপচাপ বসে থাকার মধ্যেই ওপর থেকে ভেসে এলো

মিস্টার লাহিড়ীর কাশির আওয়াজ, অনেকক্ষণের মধ্যে এইটেই প্রথম শব্দ যা বাইরে থেকে এলো, আমি আসবার আগেই চন্দনের সঙ্গে ওঁর এক প্রস্থ কথা হয়ে গেছে। সন্দেহ ওঁর নানা বাতিকের একটি, চন্দনের ব্যাপারে বিভ্রান্ত বোধ করলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

একমনে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে চন্দন। নতুন করে কী আলাপ করবো ভাবছি, শোভার মা আমাকে ভিতরে ডাকলো।

'কী রান্নাবান্না হবে, বৌদি? বাড়িতে তো কিছুই নেই!'

'কেন! সকালে যে বললে আজ চলে যাবে।'

'সে তো নিজেদের কথা—', শোভার মা বললো, 'বাইরের লোককে কি আর শুধু ডিমের ডালনা দেওয়া যায়! দেখে তো মনে হয় খাওয়া দাওয়া হয়নি কিছু!'

আমি এ-সব কিছুই জানি না। চন্দন সম্পর্কে এতোক্ষণ উদ্বেগ বোধ করেছি; উৎসাহ প্রায় কিছুই ছিলো না। দেখছি শোভার মা অনেক খুঁটিয়ে লক্ষ করেছে ওকে। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললো, 'ঘরে ঢুকে জল চাইলো। জল দিতে জিজ্ঞেস করলো কিছু খাবার আছে! রুটি মাখন দিলাম, গোগ্রাসে গিললে—'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। ঝুড়িটা দাও, আমি বাজারে যাচ্ছি—'

যতোটা সম্ভব নিজেকে গোছগাছ করে নিলাম। বাজার হাট যা করার সবই শোভার মা করে, নিতান্ত উপলক্ষ না থাকলে সাধারণত আমি বেরুই না। শেষ কবে গিয়েছিলাম মনে পড়লো, চাকরি পাবার পর—সেদিন মিস্টার সরকার এসেছিলেন। চন্দনের আসাটাকেও একটা উপলক্ষ ভেবে নিতে পারি। আজ আমি নিজেই রান্না করবো।

চন্দন বসে আছে জানলার দিকে মুখ করে। পিছন থেকে ওর ময়লা পিঠটা চোখে পড়ে। মাথার চুল থোকা থোকা হয়ে নেমে এসেছে ঘাড় পর্যন্ত। বসার ধরনে বুঝতে পারি এখনও অনেকটা নিশ্চিন্ত।

'আমি একটু বেরুচ্ছি, চন্দন।' বললাম, 'তুমি কী করবে? আসবে?'

'কোথায়?'

'কাছেই, বাজারে—'

চন্দন একটু ভাবলো। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'না। আপনি যান—'

সোজাসুজি ওর মুখের দিকে তাকালাম আমি। পরিষ্কার কপালের নিচে শান্ত ভুরু, তার তলায় ভেসে আছে টলটলে দুটো চোখ। সতর্কভাবে লক্ষ করলে বোঝা যায় আমি ভুল করেছিলাম, চন্দনের চেহারায় এতোদিনে কম পরিবর্তন হয়নি; চোয়ালে, চিবুকে কাঠিন্যের আভাস, মুখের সর্বত্র একটা রুঢ়তার ছাপ। ওই মুখে ওই চোখ কেমন বেমানান। তবু, চোখ দু'টিই সব, আশ্চর্য মায়াময়। রাতের অন্ধকারে একদিন যে-ছেলে অসহায়ের মতো কনফিডেন্স খুঁজে বেড়াচ্ছিলো, এ চোখ তার নয়।

নতুন করে চিন্তায় পড়লাম আমি। বেরুতে যাবো, চন্দন হঠাৎ বললো, 'আপনি আমাকে দশটা টাকা দেবেন?'

'টাকা!' বিব্রতভাবে বললাম, 'টাকা কী করবে?'

'দরকার আছে।' পরিষ্কার গলা চন্দনের, 'থাকলে দিন। না থাকলে অবশ্য—'

কথাটা শেষ করলো না। বলার ধরনে সামান্য জড়তা নেই, যেন অনেক ভেবেচিন্তে টাকাটা চেয়েছে ও, তাই এতোটা অকপট। আমাকেও দিতে হবে।

ব্যাগ থেকে বের করে নোটটা দিলাম ওর হাতে। চন্দন বললো, 'শোধ দিতে পারবো কি না জানি না।'

টাকাটা প্যাণ্টের পকেটে গুঁজে রাখলো চন্দন। গাল ছড়িয়ে হাসলো। তারপর হাতের মুঠো খুলে আমার দিকে মেলে ধরে বললো, 'এই পয়সাগুলো সকাল থেকে গুনছি। আটত্রিশ ছিলো, এখনও আটত্রিশই আছে। অবশ্য আরো দশটা টাকা দিলেন আপনি।'

'তোমার কি আর-কিছু দরকার ?'

'না, আর কিচ্ছু দরকার নেই।' সহজভাবে বললো চন্দন, 'অনেকদিন মাছ মাংস খাই না। বোধহয় আমার জন্যেই বাজার যাচ্ছেন, তাই বললাম—'

হাসি চাপতে পারলাম না। রহস্যময়, তবু ছেলেটিকে আমার ক্রমশ ভালো লাগছে। ভালো লাগছে ওর হাসি, দাঁড়ানো, কথা বলা। শিরশির করে উঠলো আঙুলের ডগা ; ওর পিঠ জুড়ে অসমান মাংস কি আজও তেমনি আছে !

বললাম, 'এই তোমার ঝামেলা না করা ! বসো, আমি ঘুরে আসছি।'

ঘরের বাইরে পা দিতেই জলো হাওয়ার ঝাপ্‌টা লাগলো। আমাকে ডিঙিয়ে লম্বা ছায়া পড়েছে চন্দনের, বারান্দা ছাড়িয়েও কিছুদূর লন পর্যন্ত। আমাদের ছায়া জুড়লে এখন একটা সমকোণের মতো দেখায়। একবার পিছন ফিরে দেখতে ইচ্ছে করলো চন্দনকে, তবু তাকালাম না—এগিয়ে গেলাম আস্তে আস্তে। মনে পড়লো ছায়া দেখা অশুভ, ছায়া দেখা ভালো নয়। কোনো বড়ো পাখির ডানা গোটানোর মতো দরজার ছায়াটা সরে গেল। চন্দন দরজা বন্ধ করছে, তার শব্দ, লনের ওঁপর আমার দ্রুত পা ফেলার শব্দ, মাটি ও ভিজে ঘাসের নরম হওয়ার শব্দ। এ-সব ছাপিয়ে একটানা ঝিঁঝি ডাকার শব্দ নিজেকে ক্রমাগত নিজের ভিতরে টেনে আনে। আকাশে মেঘ ও বৃষ্টির দিন বলেই সম্ভবত রাত একটু বেশি মনে হচ্ছে। না হলে রাত হতে এখনো অনেক দেরি। বেরুবার আগে আমি ঘড়িতে সাতটা বাজতে দেখেছি।

গেটের বাইরে দেখা হলো মিস্টার লাহিড়ীর সঙ্গে। এটা আকাশ-মুখো হয়ে মেঘ দেখার সময় নয় ; অন্তত মিস্টার লাহিড়ীর চরিত্রের সঙ্গে ব্যাপারটা মিশ খায় না। অস্বস্তি লাগলো। ভদ্র-লোকের সঙ্গে দেখা হলেই কিছু-না-কিছু কথা বলতে হয়। সৌজন্যের

সুবাদে অন্য-দিন ব্যাপারটা মেনে নিই, দাঁড়াই, কথা বলি। আজ সে-রকম ইচ্ছে করলো না।

মিস্টার লাহিড়ী সম্ভবত আমার মনোভাব আঁচ করতে পেরে-ছিলেন। আমি রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকের ফুটপাথে যাবার আগেই মুখ খুললেন।

'এই বৃষ্টিতে আবার কোথায় চললেন?'

'বাজারে।'

আমি দাঁড়ালাম একটু। এখন এমন কিছু বলা দরকার যাতে আর কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে না হয়। কিন্তু, যা প্রায়ই হয়, কোনো কথাই মুখে এলো না।

'আলাপ হলো আপনার ভাইয়ের সঙ্গে।' মিস্টার লাহিড়ী বললেন, 'বেশ ছেলেটি!'

ঠোঁটের কোণে হাসলাম আমি, পরিষ্কার অবজ্ঞার হাসি!

'চাকরি-বাকরি করেন, নাকি এখনো লেখাপড়ার পাট চোকেনি?'

'পড়ে।' ইতস্তত করে বললাম আমি, 'বি. এস-সি।' সেই রকমই শুনেছিলাম।

'সায়ান্স! খুব ভালো। তবে জানেন তো, কলকাতা যা জায়গা—এখানে কি কোনো ছেলে ভালো থাকে! মুখ দেখে বোঝবার উপায় নেই কার মাথায় কি মতলব ঘুরছে!'

'লাহিড়ীমশাই, আমার একটু তাড়া আছে—'

'হ্যাঁ, আসুন। জলকাদার দিন।'

গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন মিস্টার লাহিড়ী। চন্দনের কথা কিছু বিশ্বাস করেছেন কিনা জানি না। এমনও হতে পারে, তিনি কিছুই বিশ্বাস করেননি, আমাকে নিয়ে একটু খেলা করলেন মাত্র। এই ধরনের খেলায় তিনি রীতিমতো অভ্যস্ত।

কিন্তু, যেতে যেতে একাগ্র হয়ে এলো চিন্তাটা, আমি নিজেও কি নিঃশঙ্ক! মানসীর ভাই, চন্দনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বলতে

এইটুকু। তাও গত কয়েক বছরের অব্যবহারে, অসাক্ষাতে, মানসীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ প্রায় ছিন্ন হয়ে এসেছিলো ; হঠাৎ একদিন দেখা হওয়ায় পুরনো ঘনিষ্ঠতা আবার আমি ঝালিয়ে নিয়েছি। সত্যি বলতে, সেদিন ওকে মানসীর বাড়িতে না দেখলে কখনো চিনবার সুযোগ হতো না। শুধু একদিন, মাত্র কিছুক্ষণের আলাপের সূত্র ধরে কেমন অনায়াসে আজ সে উঠে এলো আমার কাছে! ভাবলে সত্যিই অবিশ্বাস্য লাগে। আমি কি ঠিক জানি, চন্দনকে আশ্রয় দিয়ে নিজের কোনো বিপদ ডেকে আনছি না!

পরবর্তী অনেকটা সময় কাটলো ভারাক্রান্ত মনে। এই এক বিরক্তিকর অবস্থা! চিন্তাটা যাচ্ছে না ; অথচ তা নিয়ে যে বিব্রত হবো, বোধ করবো অবসাদ, কিংবা, এমন যদি হতো স্পষ্ট বলে দিতে পারতাম চন্দনকে, তুমি চলে যাও ; নিজের ঝামেলায় এমনিতেই মরে আছি নিজে, তুমি আর ঝামেলা বাড়িও না—সে-রকম কিছুও নয়। এই অনুভূতিকে কী ভাবে বিশ্লেষণ করা যাবে জানি না। যতো সময় যাচ্ছে আর ভাবছি, ধীরে ধীরে বুঝতে পারছি গড়ানো জলের মতো একটা তরল অনুভব ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে মনে। আমি কি দুর্বল হয়ে পড়ছি! অতিদূর সম্পর্কের এই ছেলেটি সম্পর্কে আমি কি এমন কোনো মায়ায় আপ্লুত হয়ে পড়ছি, যা এই মুহূর্তে শুধু মানসীর পক্ষেই সম্ভব ছিলো! জানি না।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আবার বৃষ্টি নামলো। জানলার খুব কাছে এসে ফাল ফাল হয়ে সরে যাচ্ছে বিদ্যুৎ, খুব কাছেই কোথাও আচমকা শব্দে বাজ পড়লো। কিচেনের জানলার একটা পাল্লা খোলা ছিলো। জলের ছাঁট আসায় সেটা বন্ধ করতে গেলাম, বৃষ্টিতে ভেসে গেল মুখ। ঘন, পরপর বৃষ্টির মধ্যে বাইরে যতোদূর চোখ যায় তাকিয়ে দেখি, মেঘসর্বস্ব আকাশটা নেমে এসেছে নিচে, হঠাৎ তাকালে মনে হয় চাপ চাপ মাংস গলে ক্রমশ মিশে যাচ্ছে মাটিতে—তীব্র ও আক্রমণশীল এই বৃষ্টির সংস্পর্শে যে আসবে সে-ই

হারিয়ে যাবে! অনেকক্ষণ ধরে একটা কুঁই-কুঁই কাতর শব্দ কানে আসছিলো, আবার প্রখর বিদ্যুতের আলোয়—দেখি, দিক-হারানো একটা কুকুরের বাচ্চা প্রায় গেঁথে যাচ্ছে বৃষ্টিতে। সবাই কি ঘরে আছে! তীব্র বিদ্যুৎচমকে মনে পড়ে গেল সেই ভিখিরি মা ও তার শিশুটির মুখ, কবেকার বিস্মৃতি থেকে তারা উঠে এলো হুবহু, 'তোমার তো অনেক আছে, মা!' এই চোখ-ধাঁধানো বৃষ্টিতে কোথায় আশ্রয় নিয়েছে তারা!

পৃথিবীতে সকলেই কি আর নিরাপদে আছে, বেঁচে আছে প্রাণ যেমন চায় তেমনি করে! বৃষ্টি ও ঝড়ে ক্রমাগত নরম হয়ে চলেছে মাটি, একদিকের খুঁটি ঠিকভাবে পুঁততে না পুঁততেই ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে তাঁবু। আর, যারা নিরাপদ, নিরাপত্তাহীন পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে তারা কী ভাবছে কে বলবে! চন্দন বলেছিলো একটা ক্লাশ আর-একটা ক্লাশকে শুষে নিচ্ছে ক্রমাগত। হয়তো সত্যি। হয়তো নয়। হয়তো এর বাইরে—সব রকম চিন্তার বাইরে—আছে আরো কিছু, যা তুমি কোনদিনই বুঝতে পারবে না, চন্দন। বুঝতে পারবে না শুধু অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করলেই সমাজ কিছু শ্রেণীহীন হয়ে পড়বে না। যদি কখনো সুযোগ হয়, এসো, বলবো তোমাকে গভীর সেইসব অসুখের কথা—যার কোনো নিরাময় নেই; রক্তের গভীর থেকে ঘুণের মতো যা কেবল শেষ করে দিচ্ছে আমাদের! জলের নিচে বালির মতো, বা, বালির নিচে জলের মতো, অর্থহীন হয়েও যা ওতঃপ্রোত হয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের জীবনযাপনের সঙ্গে!

রান্না হয়ে গিয়েছিলো। চন্দনকে ডাকতে গিয়ে দেখলাম সোফার ওপরেই চোখে হাত চাপা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাকলাম, তারপর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে উঠে বসল।

'বৃষ্টি পড়ছে এখনো!'

'হ্যাঁ—'

'কটা বাজে ?'

'কতো আর, দশটা হবে।' বললাম, 'হাতমুখ ধুয়ে নাও, খাবার দিচ্ছি।'

চন্দন হাসলো, হাতের উল্টোপিঠে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললো, 'মাংস রাঁধছিলেন, গন্ধে গন্ধে ঘুম এসে গেল।'

'ফাজলামি রাখো।···তাড়াহুড়ো আর বৃষ্টিতে কিছুই করতে পারিনি। কাল ওয়েদার ভালো থাকলে দেখবো।'

'যাক, তাহলে আর-একটা দিনের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল—'

চন্দন হাতমুখ ধুতে গেল। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই শুনতে পেলাম ওর কাশির শব্দ। বুকে শ্লেষ্মা জমলে মানুষ এইভাবে কাশে।

সঙ্গে একটা কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগ ছাড়া আর কিছুই আনেনি। শোভার মাকে ডেকে বললাম, 'ও-ঘর থেকে তোষক বালিশ নিয়ে এসে এখানে বিছানা করে দাও। আমি ওদিকটা দেখছি—'

'এতো যত্ন করছেন!' খেতে বসে চন্দন বললো, 'ইচ্ছে করছে অনেক দিন থেকে যাই।'

'আমি বললাম, 'থাকো। মানা করছি না। নিজের দিদি কি তোমায় কম যত্ন করতো!'

'তা করতো না—,' একটু চুপ করে থেকে বললো চন্দন, 'দিদির জন্যে মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে।'

'কেন!'

'এই আর কি! সারা জীবন চাকরি করে গেল! আমার দাদাকে তো জানেন, পলিটিক্স ছাড়া আর কিছু করে না! মা না থাকলে দিদির সুবিধে হতো।'

আমার একটু খট্‌কা লাগলো। বললাম, 'চন্দন, এভাবে কতোদিন তুমি বাড়ির বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছো! মানসী কি জানে তুমি কোথায় আছো, কী করছো!'

চন্দন আমার কথার জবাব দিলো না। নিঃশব্দে খেয়ে যেতে লাগলো।

সন্ধ্যে থেকেই আমার মনে অনেক কথা জমছিলো, এলোমেলো নানা ধরনের প্রশ্ন—কিছুতেই গোছাতে পারছিলাম না। এতোক্ষণে প্রশ্নগুলো স্থির হয়ে এলো। খানিকটা বেপরোয়া হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার ব্যাপারটা কী আমাকে বলবে? তুমি কি পুলিসের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছো?'

চোয়াল নাড়া থামলো। স্পষ্ট চোখে আমার দিকে তাকালো চন্দন। 'এ-সব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন!'

প্রশ্ন নয়, চন্দন যেন আমাকে থেমে যেতে বললো। ওর গলার স্বর সেইরকম গাঢ় ও গম্ভীর। নিজেকে গুটিয়ে নিলাম আমি।

চন্দন সম্ভবত দ্বিধায় পড়েছিলো। খানিক চুপ করে থেকে বললো, 'রাগ করলেন?'

আমি বললাম, 'না। ভাবনা হচ্ছে বলেই বলা—'

'আমার একার জন্যে ভেবে কী করবেন!'

উত্তর দিলাম না। কী-ই বা উত্তর হতে পারে এই প্রশ্নের!

'এখন এইভাবেই চলতে হবে।' চন্দন বললো, 'যখন যুদ্ধ চলে তখন ব্যক্তিগত কথা ভাবতে নেই। মা, বাবা, ভাই, বোন, সুখ, আরাম—এতো সব শিকড় আমাদের! ওফ্, এই করেই এতোদিন কিছু হলো না! এইবার দেখবেন একটা কিছু হবে।'

'কী হবে? বিপ্লব?'

'জানি না। তবে এ-রকম থাকবে না। সব বদলে যাবে—সমাজ, সমাজ-ব্যবস্থা—'

'সবই তোমাদের বড়ো বড়ো কথা! তোমাদের মুরোদ কি তা জানি। এখানে বোমা মারবে, ওখানে খুন করবে, নিজেরা খুন হবে। এভাবে কিছু হয় না।'

'তবু—,' চন্দন বললো, 'চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী!'

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, তুমি বাড়ি ফিরে যাও, চন্দন, যান্না যা করছে করুক ; চন্দন হঠাৎ হেসে উঠলো শব্দ করে।

'আপনারা কিন্তু একদম বদলাবেন না ! আপনি, দিদি—এরা সবাই !'

রাত বেড়ে যাচ্ছে দ্রুত। মিস্টার লাহিড়ীর ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজার শব্দ হলো। বৃষ্টি থামেনি। এখনো মাঝে মাঝে মেঘের ডাক শুনতে পাচ্ছি। এতোক্ষণে, কাজ চুকে যাবার পর, ক্লান্তি লাগছিলো। হাই উঠলো। অনেকদিন পরে আজ নিজের হাতে কাজ করার ফলেই সম্ভবত তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

চন্দন বললো, 'আজ ঘুমটা ভালোই হবে। আপনি খেয়ে দেয়ে নিন, শুয়ে পড়ুন।'

'নিচ্ছি।' জলের গ্লাসে বই চাপা দিয়ে, জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার আর-কিছু লাগবে ?'

'না।'

চন্দন পাশ ফিরলো ; বালিশটা চেপে ধরলো মুখের ওপর। আলো নিভিয়ে তবু দু'এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলাম আমি।

'আমি বরং মানসীকে একটা খবর দিই তুমি আমার এখানে আছো ?'

'কাল বলবো—'

আমি চলে এলাম। আপাতত আর-কিছু বলার নেই। খাওয়া ও ঘুমোনো ছাড়া আর-কিছু করার নেই। এইভাবে, হয়তো অন্যদিনের চেয়ে একটু ব্যস্তভাবে, কেটে যাচ্ছে আর-একটা দিন। শরীরে হঠাৎ কাঁটা দিয়ে এলো। তবু ভালো, প্রতিদিন এইভাবে ভাবি না !

অন্ধকারে, বিছানায়, একের পর এক মুখ ভেসে ওঠে চোখের ওপর। মহীতোষের মুখ, সুব্রতর মুখ, মনীশের মুখ। তারপর পরিতোষ আর টিকলুর মুখ। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে পরপর ভেসে যাচ্ছে তারা। প্রায় অস্পষ্ট অথচ সাবলীল এইসব মুখ ধীরে ধীরে আবার অপরিচ্ছন্ন হতে

থাকে। 'আয় ঘুম, আয় রে—,' একসময় টিক্‌লুকে যেভাবে ঘুম পাড়াতাম সেইভাবে ঘুম পাড়াই নিজেকে। কবরখানায় বিভিন্ন স্মৃতি-ফলকের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে রাস্তা—আমি হাঁটতে থাকি। টের পাই ঘুম আসছে, শরীর শিথিল ও মোলায়েম হয়ে আসছে হাত-পা। শব্দ থেকে শব্দান্তরে যেতে যেতে এক সময় বৃষ্টির শব্দও থেমে যায়। অনেক রাতে শোভার মা আমাকে ডেকে তুললো। বুঝি তখনো বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে সমানে।

'কী কাণ্ড!' শোভার মা বললো, 'দরজা হাঁ হাঁ করছে! সেই দাদাবাবু চলে গেছে কখন—!'

'চলে গেছে!' শব্দটা বিশ্রীভাবে বেরিয়ে এল গলা থেকে। মুহূর্তে কেমন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লো নিঃশ্বাস। আর-কিছু বলতে বা ভাবতে পারলাম না।

শোভার মা অপেক্ষা করছিলো। আস্তে আস্তে বললাম, 'কী আর করবে! দরজাটা লাগিয়ে দাও।'

তেরো

চন্দন আজও ফেরেনি। একদিন প্রবল বৃষ্টির রাতে আমার আশ্রয় ছেড়ে কোথায় চলে গেল সে; আর তার ফেরা হয়নি। পুলিস এখনো তাকে খুঁজছে; শুনেছি তিনটি খুনের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে তাকে। সত্যি মিথ্যে জানি না। শুধু ভাবি, এতোগুলি মৃতের অভিসম্পাত নিয়ে কোথায় আত্মগোপন করে আছে চন্দন। যেখানেই থাকুক, কেমন আছে। মাংস রান্নার গন্ধে এখনো কী তার চোখ জুড়িয়ে আসে ঘুমে! কেন সে গোপন গুহা থেকে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে জানিয়ে দেয় না পৃথিবীকে, মিথ্যে তোমরা আমার পিছু নিয়েছো; ছাখো, তাকাও আমার চোখের দিকে—এ-রকম চোখ যার, সে কি কখনো খুন করতে পারে!

এক একদিন গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় আমার। আচ্ছন্নতার ঘোরে হঠাৎ মনে হয় বৃষ্টি পড়ছে চতুর্দিকে, অবিরাম বৃষ্টির শব্দে নীরব চরাচরের ওপর দিয়ে স্থির পায়ে হেঁটে আসছে চন্দন—চুল আরো উস্কোখুস্কো, জুতোয় ঘন কাদার দাগ, মাত্র দশটা টাকা সম্বল করে আর কতোদিন সে ঘুরে বেড়াবে একা! আমি জানলা খুলে দাঁড়িয়ে থাকি। অন্ধকার ঢুকে পড়ে আমার বুকের ভিতর, ঘুরতে থাকে চিমনির ধোঁয়ার মতো—অন্ধকার মিশে যায় আমার নিঃশ্বাসে। আমার আশ্রয়ও কি তোমার কাছে নিরাপদ মনে হয়নি, চন্দন! আমি যা খুঁজছি, যার জন্যে নিরন্তর প্রার্থনা আমার, কেমন সহজে তুমি তা অগ্রাহ্য করে গেলে! তা হলে কি এটাই সত্যি, একাকিত্ব, ভয় ও নিরাবলম্বনের বাইরেও আছে অন্য কোনো আকর্ষণ, এই সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে অনায়াসে যা নিয়ে যেতে পারে দূরে, আরো গভীর কোনো অর্থময়তার দিকে!

মানসীর সঙ্গে আজকাল প্রায়ই দেখা হয়। মফঃস্বল স্কুলের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে ও। এখানে ওর মাকে দেখাশোনার লোক

নেই, তাঁকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে হয়। এখন দু'তিনটে টিউশন করে বাড়িতে; চেষ্টা করছে—হয়তো এখানেই চাকরি পেয়ে যাবে কোনো স্কুলে। ওর দাদা এখন আগের চেয়ে বেশি উদ্‌ভ্রান্ত—রাজনীতি ভুলে ঘুরে বেড়ান পুলিসের দরজায় দরজায়; তারা কি চন্দনকে ফিরিয়ে দিতে পারে না! এক একদিন ট্রামের সীটে পাশাপাশি বসে আমি আর মানসী চলে যাই শেষ পর্যন্ত, আবার ফিরে আসি। একই রকম নিঃশ্বাস পড়ে আমাদের। কথা বলি না কোনো। মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে একসময়ে গভীর অভাব উঠে আসে আমার গলা পর্যন্ত। তোমাদের সমাজ হয়তো সত্যিই বদলে যাবে একদিন। কিন্তু, ততোদিন কি আমরা অপেক্ষা করতে পারবো!

আমি আছি একই রকম। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে কেটে যাচ্ছে দিন, একই বিভিন্নতায়—বিকেলের নদীর দিকে তাকিয়ে আমি শুধু নিজেকেই দেখি। সময় কেটে যায়।

পরিতোষ আজকাল আর আগের মতো আসে না। কিছু দরকার পড়লে ফোন-টোন করে। হয়তো উৎসাহ পায় না। আমিই পরিতোষকে ফিরিয়ে দিলাম, না পরিতোষ আমাকে, বুঝতে পারি না। আসন্ন শীতের ভয়ে গাছ থেকে ঝরে যায় সমস্ত পাতা; ঝড়ো হাওয়া বিশ্রাম দেয় না তবু। তার প্রভাবে নিষ্পত্র গাছের ডালগুলো কাঁপে থরথর করে। সামনের সিজনে টিক্‌লু চলে যাবে কার্শিয়াং-এ, পরিতোষই সব ব্যবস্থা করেছে। দূরত্বে থেকে সে আস্তে আস্তে খুঁজে নেবে নিজেকে। মাঝে মাঝে ভাবি, গত কয়েক বছরে যা যা ঘটে গেল তার সবটাই অর্থহীন, পৃথিবীকে আরো একটি দয়া-মায়া-ভালোবাসায় বঞ্চিত শিশু উপহার দেওয়া ছাড়া এদের আর কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না।

মহীতোষ ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। একদিন সন্ধ্যায় আমি যাচ্ছি সুব্রতর পাশে, গাড়িতে; পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাফিকে গাড়ি

দাঁড়ালো। পর পর অনেকগুলি গাড়ি ও হর্ণের শব্দের মধ্যে দিয়ে চোখে পড়লো ডান দিকের একটা গাড়িতে বসে আছে মহীতোষ; পাশে, সম্ভবত, তার স্ত্রী। আমাকে চোখে পড়ার কথা নয়। বোধ হয় এটাই স্বাভাবিক—কারও জন্যে সুনিশ্চিত জায়গা থাকে না কোথাও; যে যখন যেখানে পারছে বদলে নিচ্ছে বসার জায়গা! লাল হলদে হয়ে মিশে গেল সবুজে, গাড়িটা হারিয়ে গেল। অনেকক্ষণ এক জায়গায় ধরে রাখা নিঃশ্বাসটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দিলাম আমি।

মনীশ এখনো আসে তার প্রচণ্ডতা নিয়ে; আমি খুব দূরে থাকতে পারি না। প্রায় যান্ত্রিক নিয়মে ডুবে যাই তার প্রেমহীন আকর্ষণে; জানি, এর থেকে পরিত্রাণ পাবো না কখনো। নিজের ইচ্ছায় একদিন যে-ক্ষতের সৃষ্টি করেছি, তাকে আড়াল করছি এইরকম প্রসাধন দিয়ে; কেউ না জানুক—যেন তার দূষিত গন্ধ ছড়িয়ে না পড়ে। আমি তো অনেকদিন আগেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, মৃতের সঙ্গে সহবাসে তুমি কবে ক্লান্ত হবে, মনীশ! এইভাবে ভেবে নিই গোটা বিষয়টাকে; এইভাবে শরীরের সান্নিধ্য থেকে আস্তে আস্তে চলে যাই দূরে।

আবার ফিরে আসি। শরীর ভিন্ন আরো এক অস্তিত্ব আছে আমার—যে ক্ষমায় দোলে, নুয়ে পড়ে সহানুভূতিতে; ফলবতী গাছের মতো যার দেবার ক্ষমতা ফুরোয়নি এখনো। সারাক্ষণ অনুভব করি তাকে; শোওয়া, বসা, বেড়ানো, বিভিন্ন কাজে আর একাকিত্বে—আমার সবকিছুর মধ্যে। সবকিছুর পরেও তবু থেকে যায় অনিঃশেষ অপেক্ষা।

মিস্টার সরকার একদিন মুনলাইট পিকনিকের আয়োজন করেছিলেন। বারাসতের কাছে এক বাগান বাড়িতে দল বেঁধে চললাম সকলে। মিহি জরির মতো জ্যোৎস্না নেমে এল মাটিতে, হাওয়ায় মৃদু শীত, প্রথম শিশিরের আবির্ভাব জুড়িয়ে দিচ্ছে শরীর।

খুব হৈ-চৈ হলো। অনেক রাতে কে কোথায় ছিটকে পড়লো ; আমি একা—হঠাৎ আমাকে টেনে নিলো সুব্রত। কেউ জানলো না ; নিঃশব্দে চলে এলাম সকলের সংস্পর্শ থেকে ; মাইল মাইল রাস্তা পড়ে আছে সামনে। যেতে যেতে গাড়ি থামালো সুব্রত ; তার হাত আমার জানুতে, আমার মুখ তার কাঁধে—জ্যোৎস্নার আড়ালে হারিয়ে যেতে যেতে বহুদিন পরে আমি ফিরে পেলাম সেই অনুভূতি, একলা বুকে যা বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায় না।

হয়তো সুব্রতকে আমি বিশ্বাস করতে পারি। হয়তো পৃথিবীর সঙ্গে এই আমার শেষ বোঝাপড়া। হয়তো শেষের এই খেলায় আমিই জিতে যাবো।

শীতের গোড়ায় ডাক্তারের কাছে ছুটতে হলো আমাকে। অনেক ভাবনা চিন্তার পর ঝুঁকিটা নিলাম। না নিয়ে উপায় ছিলো না।

এই ভয়টা আমার বরাবরই ছিলো। মাঝে মাঝে ভাবতাম যথেচ্ছ ব্যবহারের শোধ শরীর একদিন তুলবে; শরীরের দাম দিতে হবে শরীর দিয়ে এবং তাই ঘটলো। ভয়াবহভাবে জলে পড়ে যাওয়ার মতো, ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে সন্দেহ হলো একদিন—সম্ভবত আবার আমি মা হতে চলেছি। এটা এমনই একটা ব্যাপার স্বপ্নেও যাকে গ্রহণ করা যায় না। জেনেশুনে জিভে সেঁকো বিষ ছোঁয়ানোর মতো ঘটনাটা বিশ্বাস করার অর্থ সর্বনাশ স্বীকার করে নেওয়া। আদরের শরীর তখন ঘৃণার বস্তু, ঘৃণা করতে হয় নিজেকে—আত্মঘাত ও মৃত্যু ছাড়া আর কোনো পরিণাম চিন্তা করা যায় না।

সম্ভবত আমি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। অথচ আমি তো বাঁচতেই চেয়েছিলাম!

সন্দেহটা ঘনীভূত হবার মুখেই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার কথা মনে পড়লো আমার। হয়তো ইতিমধ্যেই যাওয়া উচিত ছিলো। যে আসছে, একান্তভাবেই সে আমার রক্ত, মাংস ও অভিজ্ঞতার অংশ; তাকে হত্যা করতে হবে ভেবে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। মনে পড়লো আমার প্রথম গর্ভধারণের দিনগুলির কথা। সেইসব দিনগুলি কেমন অকাতরে হারিয়ে গেল চিন্তা ও অভিজ্ঞতা থেকে! এখন সবই মনে হয় দূর স্মৃতি! হয়তো এটাই সত্যি—আমার এই শরীরটাও আর আমার নিজের নয়, তার অধিকারও ন্যস্ত অন্য কোনো হাতে। এখন প্রতি মুহূর্তে আমি তার সবল নিষ্পেষণ অনুভব করতে পারছি।

গায়নাকোলজিস্টের চেম্বারে গিয়ে অস্থিরতা বেড়ে গেল আরো। এতোদিন যা ছিলো অপ্রত্যক্ষ, সন্দেহ মাত্র, ক্রমশ তা প্রবিষ্ট হয়ে পড়ছে চেতনায়, সন্দেহ আর সন্দেহ থাকছে না। বধ্যভূমিতে এসে

দাঁড়ানোর মতো চরম মুহূর্ত ও আমার মধ্যে সেই সংক্ষিপ্ত সময়ের ব্যবধানে এসে পৌঁছুলাম—মৃত্যু ও জীবন যেখানে শেষবার পরস্পরের দিকে তাকায়।

স্লিপ পাঠানোর পর ডাক্তারের সহযোগী মাঝবয়সী মহিলাটি—নার্স বলাই ভালো—ছোটো একটি খুপরির মধ্যে ডেকে নিয়ে গেলেন আমাকে। নাম জানানোই ছিলো ; বয়স, ঠিকানা ইত্যাদি একটি নোট বইয়ে টুকে নিয়ে তাকালেন আমার মুখের দিকে।

'ম্যারেড ?'

আমি ঘাড় নাড়লাম। তারপর নার্সের চোখ আমার কপালে নিবদ্ধ দেখে বললাম, 'স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই।' গলা কাঁপছিলো ; তবু এসব জায়গায় স্পষ্টতা কাজ দেয়। আরো প্রাঞ্জল করার জন্যে বললাম, 'ডিভোর্স হয়ে গেছে—'

'ও, সরি।' নার্স চোখ নামিয়ে নিলেন। হাতের নড়াচড়া দেখে মনে হলো এটাকেও লিপিবদ্ধ করবেন কিনা ভাবছেন। আমার কোনো তাড়া নেই।

'কী কমপ্লেন বলুন ?'

অল্প নড়ে উঠলাম আমি। নার্সের দৃষ্টি ঠিক আমার দুই ভুরুর মাঝখানে—তীব্র না হলেও একাগ্র; এমন দৃষ্টি যে-কোনো প্রতিরোধ ভেঙে দিতে পারে। কী করে ঘটনাটা শুরু করবো ভাবলাম।

'সঙ্কোচ করার কিছু নেই।' নার্স বললেন, 'কী কমপ্লেন বলুন। এরপর ডক্টর আপনাকে দেখবেন।'

'মানে ', গলা পর্যন্ত কান্না ঠেলে এলো, 'বোধহয় আমি কনসিভ করেছি—'

'ও।'

নার্সের পরবর্তী প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করতে করতে নিজেকে সংযত করলাম আমি।

'এটা কবে বুঝতে পারলেন ?'

'দিন পনেরো আগে, মানে—'

কথাটা শেষ করতে পারলাম না। নার্স বললেন, 'তার আগে? সিস্টেমে কোনো গোলমাল ছিলো না?'

'না।'

খুব স্বাভাবিকভাবে উত্তর দিলাম আমি, সহজতম গলায়। খুটখুট করে খাতায় কী লিখলেন নার্স। হাতের লেখা এতোই অস্পষ্ট ও জড়ানো যে এক হাত দূরত্বে বসেও পাঠোদ্ধার করা সহজ নয়। লেখা শেষ করে একটুক্ষণ ভাবলেন কিছু, মুখ তুললেন।

'লাস্ট ডেটটা মনে আছে?'

'হ্যাঁ। গত মাসের পনেরোই—'

আজ ঊনত্রিশ। দেয়ালের ক্যালেণ্ডারের দিকে দু'এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়ালেন নার্স।

'ঠিক আছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন। ভেতরে একজন আছেন, ডক্টর ফ্রী হলেই আপনাকে ডাকবো।' বলতে বলতে পাশের ঘরের পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেলেন তিনি।

তেরো বছর বয়সটা আমার পক্ষে খুব সুখের ছিলো না। ওই বছরেই আমার মা মারা যান। ওই বছরেই নারীত্ব সম্পর্কে আমি প্রথম সচেতন হয়ে উঠি।

দিনগুলি এখনো মনে পড়ে স্পষ্ট। সদ্য ক্লাস নাইনে উঠেছি। স্কুলেই একদিন অসহ্যভাবে ধরে এলো শরীর, গা হাত পা মোচড়াতে শুরু করলো—একটা প্রবল উষ্ণতা গ্রীষ্মের দুপুরের হাওয়ার মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগলো শরীরে। হয়তো তার আগেও কোনো কোনো উপসর্গ ছিলো, রক্তের স্বাভাবিকতায় আমি তাদের উপেক্ষা করে গেছি। কিন্তু সেই মুহূর্তে যা ঘটলো তার সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা করা যায় না। হঠাৎ অনুভব করলাম জঙ্ঘা ও কোমর জুড়ে ছুঁচ ফোটানোর মতো ব্যথা; ব্যথাটা থাকলো না বেশিক্ষণ—কিন্তু যাবার আগে সম্পূর্ণ এলোমেলো করে দিয়ে গেল আমাকে। এ-রকম

অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি। মৃদু ভয়ে ও আশঙ্কায় মাঝে মাঝেই কেঁপে উঠছিলো শরীর। শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে রিক্সায় চেপে তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম বাড়িতে। দরজা খুললেন মা নিজে। তাঁর কাছে আমি ঝুনু; আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী হলো, ঝুনু! এতো তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল! আবেগ তখন অনাবিষ্কৃত রহস্যের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে; মার কথার জবাব না দিয়েই ছুটে গেলাম বাথরুমে। কান্নায় ফেটে যাচ্ছে বুক। মাকে এড়িয়ে বাথরুম থেকে সোজা চলে এলাম বিছানায়। কী হয়েছে না হয়েছে সে-সম্পর্কে তখনো অস্পষ্ট হয়ে আছি, তবু কিছুতেই কান্না সামলাতে পারলাম না। মা সম্ভবত ব্যাপারটা টের পেয়েছিলেন। ভয় পাবার কিছু নেই, আদরে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, সব মেয়েরই এ-রকম হয়। আজ থেকে তুমি বড়ো হয়ে গেলে। এখন থেকে খুব সাবধানে থাকবে, শরীরের যত্ন নেবে। এসো, জামা কাপড় বদলে নাও।

সেদিন বিকেলে মা ও আমি একসঙ্গে বেড়াতে বেরুলাম। আমার পরণে ছিলো মার লাল সিল্কের শাড়িটা। রাস্তায় কেউ কেউ আমার দিকে ফিরে তাকালো—আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। বড়ো হয়ে গেছি এই ভাবনাই সারাক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখলো আমাকে।

আজ, এখনই, ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করতে করতে বিশেষ একটি দিনের কথা কেন মনে পড়লো জানি না। হয়তো এর কোনো কারণ আছে, হয়তো নেই। থাকা, না-থাকা, আপাতত দুটোই আমার কাছে সমান।

সে-বছরের শেষ দিকে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেলেন মা। দেখতে দেখতে কতোদিন যে হয়ে গেল।

স্মৃতি দুঃখময়। অন্তত আমার বেলায় এ-কথাটা খুবই সত্যি। একা অবস্থায় অতীত যখন অতর্কিতে হানা দেয়, মাঝে মাঝে ভাবি, হয়তো আমার দুঃখের ধারণায় মাথামুণ্ডু নেই; আর, সত্যি সত্যিই কি সুখ বলে কিছুর সংস্পর্শ আমি পাইনি! ছোটোবেলা ও কৈশোরের

দিনগুলি, মা এবং বাবা, বিয়ে, তারপর মহীতোষ, তারপর টিক্লু—এদের সবকিছুই কি দুঃখের সঙ্গে জড়ানো! না কি সুখ দুঃখ নিতান্তই এলোমেলো ধারণা মাত্র, একই হাতের এ-পিঠ ও-পিঠ, যে যেমন করে দেখার দেখে নেয়—সুখী হয় বা হয় দুঃখিত। আর কেউ কেউ যারা আমার মতো, দুঃখ-সুখের একাকার ছায়ায় বসে কাঁদে!

নিজেকে হঠাৎ বড়ো বেশি নির্ভার লাগতে শুরু করেছিলো। নার্স আমাকে ভিতরে ডেকে নিলেন।

আবার ফিরে আসছি নিজের মধ্যে। পরিষ্কার মনে পড়ে গেল কী জন্যে এসেছি এখানে—বর্তমানের চেয়ে নিষ্ঠুরতম সময় আর নেই। হঠাৎ রক্তচাপ বেড়ে গেলে যেমন হয়, তেমনি দ্রুত হয়ে এলো নিঃশ্বাস, হাত-পা কাঁপতে শুরু করলো।

ডাক্তার একবার চোখ তুলে দেখলেন আমাকে। তারপর কিছুক্ষণ আগে লেখা নোট বইয়ের ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলে মেয়ে—মানে—আগের কোনো ইস্যু আছে নাকি?'

'একটি ছেলে।' সামান্য ইতস্তত না করে বললাম আমি, 'বছর ছয়েকের।'

'আই সী।' ডাক্তার বললেন, 'শুয়ে পড়ুন।' বলে পার্টিসনের আড়ালে চলে গেলেন।

নার্স আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করতে বললেন। চোখ বন্ধ করার পর পেটিকোটের দড়ি আলগা করে শাড়িটা তুলে দিলেন কোমর পর্যন্ত। আর, প্রায় তৎক্ষণাৎ, গ্লাভ্‌স্‌-পরা একটি হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম, ঠোঁট চেপে ধরলাম দাঁত দিয়ে। একমুহূর্ত; জুতোর শব্দে বুঝলাম ডাক্তার ফিরে যাচ্ছেন।

'এবার গুছিয়ে নিন নিজেকে।'

পার্টিসনের আড়ালে বেসিনে জল পড়ার শব্দ। ডাক্তার চেয়ারে

বসবার আগেই দ্রুত তৈরি হয়ে নিলাম আমি। চেয়ার দেখিয়ে নার্স বললেন, 'বসুন।'

'এখনও কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।' নোট বইয়ের ওপর খসখস করে কিছু লিখে ডাক্তার আমার দিকে তাকালেন। 'একটা ইঞ্জেকসন দিয়ে দিচ্ছি, যদি কিছু হয়ে থাকে ডিসল্‌ভ্‌ড্‌ হয়ে যাবে। পাঁচ দিন পরে খবর দেবেন।'

'যদি কিছু না হয়?'

কথাটা বেরিয়ে এলো স্বতঃস্ফূর্ত। এখন আমার মনে অনেক জোর, প্রায় হত্যাকারীর সাহস নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'তখন ভাবা যাবে। এনিওয়ে—,' তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা শেষ করতে চাইলেন ডাক্তার, 'এখনই ওসব ভাববার কিছু নেই। এটা নরমাল ব্যাপারও হতে পারে। ইঞ্জেকসনটা নিয়েই দেখুন না!'

নার্সের সঙ্গে বাইরে এসে আবার ঘরটিতে ঢুকলাম আমরা। ইঞ্জেকসনের ছুঁচটা যখন গায়ে বিঁধলো, কোনোরকম যন্ত্রণা অনুভব করলাম না। আগেও করিনি; যেন যা ঘটছে, ঘটে যাচ্ছে অনুভূতির বাইরে। সম্ভবত আমি অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছি। ঠিক জানি না। প্রয়োজন কখনো কখনো নির্বোধ করে দেয় মানুষকে। দুটোর যে-কোনো একটা সত্যি হতে পারে।

নার্সের হাতে ফীজ-এর টাকা তুলে দিয়ে অনুভূতিহীন আমি বেরিয়ে এলাম বাইরে—অনেকক্ষণ পরে, রাস্তায়। শীত ও ধোঁয়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে শালটা ভালো করে জড়িয়ে নিলাম গায়ে।

এখন আমাকে যেতে হবে। একটু ভেবে আমি বাঁদিকে হাঁটতে শুরু করলাম। কিছুদূর হেঁটে অন্যমনস্কতার মধ্যেই থেমে দাঁড়ালাম আবার, ভাবলাম, হয়তো ডানদিকে গেলেই ভালো হতো। এটা ঠিক, এখন আমি বাড়ি ফিরবো না। তাহলে কোনদিকে যাবো?

আমার আশপাশে দিয়ে মানুষজন হাঁটতে লাগলো। এদিক থেকে ওদিকে ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, মোটর ক্রমাগত ছুটে যাচ্ছে, আসছে,

যাচ্ছে। সমবেত ধ্বনি আলতোভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে কান। একা দাঁড়িয়ে এইসব দেখতে দেখতে গলা পর্যন্ত নিঃশ্বাস উঠে এলো আমার। মনে হলো অনেকদিন এই সরব ব্যস্ততা লক্ষ করিনি আমি। আজ একটু দেখি।